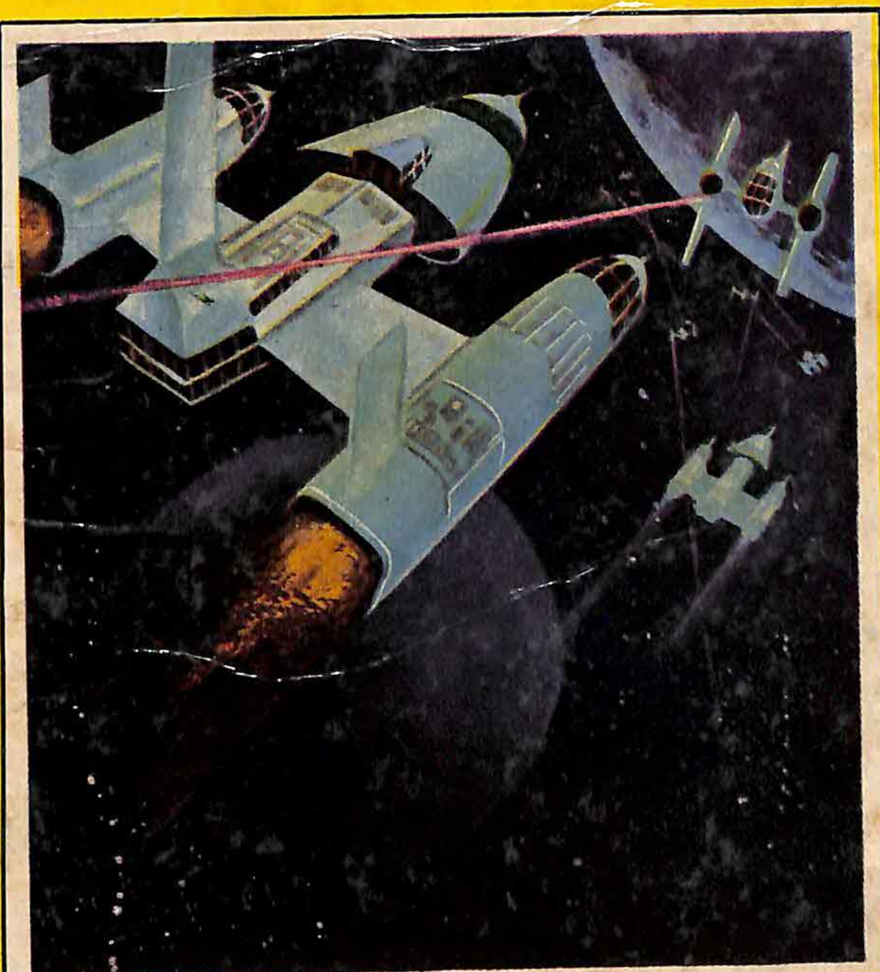
কল্পবিজ্ঞানের গল্পমালা

64



কল্পবিজ্ঞানের গল্পমালা

দেবব্রত মল্লিক
সম্পাদিত

পরিবেশনা
মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৯০। প্রকাশক ঃ স্বপন চক্রবর্তী, সিনেটহল পাবলিশার্স, কলকাতা-১৮। মুদ্রক ঃ অশোক কুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৬। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ স্বপন দেবনাথ। মূল্যঃ দশ টাকা।

Kalpa Bijnaner Galpa Mala
Edited by Debabrata Mollick
Rs. 10·00

কল্পবিজ্ঞানের
গল্পমালা

আমাদের কল্পনার জন্ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি থেকে এবং এই বুদ্ধিবৃত্তির ফসলই বিজ্ঞান। মানুষ যার জন্য গর্বিত। অথচ মানুষ অজান্তেই একদিন বিজ্ঞানকে নিজের একদম কাছে করে নিয়েছে। মানুষের জীবনে ক্রমবিকাশে একদিন হল বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ।

সে সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করতে শিখল। কারিগরী কৌশল এবং তার প্রয়োগ ক্রমশ মানুষের জীবনকে করে তুলল অনায়াসসাধ্য। মানুষ আবিষ্কারকরতে শিখল তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য। বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন উপায়। সুসংহত চেতনা মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে শৃঙ্খলাবোধ।··· সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলেছে নতুন নতুন উদ্ভাবন আর চিন্তাশক্তি নিয়ে। অন্তহীন মানুষের অনুসন্ধিৎসা—যতদিন যাচ্ছে ততই সে আরো এবং আরোর পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। সে হয়ে উঠছে কল্পনাপ্রবন। তারপর এক সময় এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করে তার শান্তি।

মানুষের এই কল্পনা উদ্ভাবন অনুসন্ধিৎসা—সবকিছুর মূলে রয়েছে সরাসরি কিংবা অন্য কোন ভাবে প্রয়োজন বোধ। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে এই প্রয়োজনবোধ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। যতদিন মানুষ চলবে ততদিনই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ফসল বিজ্ঞান নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করে এগিয়ে যাবে।

ক্রমবিবর্তন মানুষের ইতিহাস। আজকের বিজ্ঞানের ইতিহাসও তেমনি নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জীবনের ওঠা নামা চলা ফেরার সঙ্গে বিজ্ঞানের চলাও বিরামহীন। অপ্রতিরোধ্য। জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ-সূত্র অবিচ্ছেদ্য। নিছক চলার জন্যই চলা কিংবা কিছু করার দোহাই নিয়ে বিজ্ঞানের বসে থাকা নেই। তার পেছনে আছে যুক্তি বুদ্ধি খাটানোর ভিন্ন ভিন্ন ফিকির ফন্দি সন্ধানী মন—এই সবকিছুকে ঘিরেই রয়েছে বিজ্ঞান।

তাই আমাদের লেখাতেও পড়ছে তার ছায়া। শুধুমাত্র কিছু সামাজিক সমস্যা এখন আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু নয়। গল্প লেখা হচ্ছে আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে কল্পনা মনে হলেও, এটা শুধুই ভাববিলাস এবং কল্পনা নয়। কেননা বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার যোগসূত্র খুবই নীবিড়। একে অন্যের পরিপূরক। তাই এই জাতীয় লেখার প্রসার যত বাড়বে ততই মঙ্গল। মানুষের চিন্তা ভাবনায় নতুন নতুন দিক উদঘাটিত হবে। সে ভাবতে শিখবে। তার অনুসন্ধিৎসু মন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা নিয়ে গড়ে তুলবে এক নতুন জগত। অন্য আর এক পৃথিবী।

দেবব্রত মল্লিক

দেবব্রত মল্লিকের বিজ্ঞানবিষয়ক সম্পাদিত বই ঃ

বিজ্ঞান কোষ [পাঁচ খণ্ড]

বিজ্ঞানের গল্প

কিশোর জ্ঞানকোষ [দশ খণ্ড]

বিষয়সূচী

কল্পবিজ্ঞানের
গল্পমালা

আর্থার সি ক্লার্ক

জীবনের প্রথম থেকেই আর্থার ক্লার্ক যার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন মিঃ টিপার। একজন স্কুল শিক্ষক। তার কাছ থেকেই প্রথম ক্লার্ক প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারদের গল্প শোনেন এবং সেগুলো নিয়েই চলে তার গল্প বানানোর পরিকল্পনা।

তখন ক্লার্কের বয়স মাত্র নয়, স্কুল শিক্ষক মিঃ টিপার ঠিক করলেন ওর পড়া-শোনায় আরো ব্যাপ্তি আনা প্রয়োজন। তাই ক্লার্ককে ইংলণ্ডের বিশপস্ লির্ডাড স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে হুসেস গ্রামার স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখান থেকেই ক্লার্ক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে সিভিল সার্ভিস নিয়ে শিক্ষা নিতে শুরু করেন। এই সময় ওর বয়েস হয়েছিল উনিশ।

যে বইটি পড়ে ক্লার্ক সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যা পড়ার পর ক্লার্কের মনে নতুন নতুন সব ভাবনার উদয় হয়েছিল, সে বইটির নাম লাস্ট এণ্ড ফাস্ট মেন। লেখক ডবলু ওলাফ স্ট্যাপলেডন। ক্লার্কের জীবনে প্রথম লেখা ছাপা হয় হুসেস পত্রিকায়। এরপর থেকে এই পত্রিকায় ওর আরো বহু লেখা ছাপা হয়েছিল।

আর্থার ক্লার্কের জন্ম হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইংল্যান্ড শহরের পশ্চিমে মাইশহেডে। আর্থার ক্লার্কের প্রকাশিত কিছু বইয়ের নাম প্রকাশকালের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হল ঃ

দি স্যাণ্ড অফ মার্স। আইল্যাণ্ডস ইস দি স্কাই। চাইল্ডহুড'স এণ্ড। এগেইনস্ট দি ফল অফ নাইট। এক্সপিডিশন টু আর্থ (গল্প সংগ্রহ)। প্রিলুড টু স্পেস। আর্থলাইট। রীচ ফর টুমরো (গল্প সংগ্রহ)। দি সিটি এণ্ড দি স্টারস্। দি ডীপ রেঞ্জ। টেলস্ ফ্রম দি হোয়াইট হার্ট (গল্প সংগ্রহ)। দি আদার সাইড অফ দি স্কাই (গল্প সংগ্রহ)। অ্যাক্রস দি সী অফ স্টারস্ (গল্প সংগ্রহ)। টেলস্ এ ফল অফ মুনডাস্ট। ফ্রম দি ওসান, ফ্রম দি স্টারস্ (গল্প সংগ্রহ)। টেলস্ অফ টেন ওয়ার্ল্ডস্ (গল্প সংগ্রহ)। ডলফিন আইল্যাণ্ড। অ্যান আর্থার

ক্লার্ক অমনিবাস (গল্প সংগ্রহ)। প্রিলুড টু মার্স (গল্প সংগ্রহ)। টাইম প্রোব (আর্থার ক্লার্ক সম্পাদিত বই)। নাইন বিলিয়ন নেমস্ অফ গড (গল্প সংগ্রহ)। ২০০১ঃ এ স্পেস ওডিসি। এ সেকেন্ড আর্থার ক্লার্ক অমনিবাস (গল্প সংগ্রহ)। দি লায়ন অফ কমারি এন্ড এগেইনস্ট দি ফল অফ নাইট (গল্প সংগ্রহ)। থ্রী ফর টুমরো (সম্পাদিত বই)। দি লস্ট ওয়ার্ল্ডস অফ ২০০১ (গল্প সংগ্রহ। দি উইন্ড ফ্রম দি সান (গল্প সংগ্রহ)। অফ টাইম এন্ড স্টারস্ (গল্প সংগ্রহ)। রাঁদেভু উইথ রামা। দি বেস্ট অফ আর্থার সি ক্লার্ক (গল্প সংগ্রহ)।

লেখকের প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে আর্থার ক্লার্ক সিংহলে বসবাস করছেন।



রিফিয়ুজি

অবতরণ-স্থানে অপেক্ষা করার সময় ক্যাপটেন সাণ্ডার্স বলে, 'উনি যখন ওপরে আসবেন, ওঁকে আমি কি ভাবে সম্বোধন করবো ?'

চিন্তাপূর্ণ নীরবতা দেখা দেয়। ভদ্র আদব-কায়দার এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে থাকে নেভিগেশন অফিসার এবং সহকারী পাইলট। তখন মিচেল প্রধান কণ্ট্রোল প্যানেলে তালা লাগিয়ে দেয়। শক্তি তুলে নেওয়ার ফলে জাহাজের বহুল কলকব্জা বেহুঁশ হয়ে পড়ে।

আস্তে আস্তে মিচেল বলে, 'ইয়োর রয়াল হাইনেস—এই হচ্ছে প্রকৃত সম্বোধন।'

'দূর!' ঘোড়ার মত নাক নেড়ে ক্যাপেটেন বলে, 'এমন সম্বোধন মরে গেলেও আমি কারুকে করতে পারবো না!'

সাহায্যের ভঙ্গিতে চেম্বার্স বলে, 'আজকের প্রগতির দিনে আমার বিশ্বাস 'স্যার' বলাই যথেষ্ট। ভুলে গেলেও আপনার চিন্তার কারণ নেই। উঁচুতে অনেকদিন কেউ ওঠেনি। তাছাড়া, এই হেনরী এমন কিছু দুর্দান্ত ব্যক্তি নন, পরিকল্পনা মাফিক—যেমন ছিলেন তিনি, যাঁর ছিল অনেক স্ত্রী।'

কথার পিঠে মিচেল বলে, 'সমস্ত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তা হল—হেনরী একজন চমৎকার স্বভাবের যুবক। খুব বুদ্ধিমান। উনি লোকজনদের প্রয়ই এমন সব প্রশ্ন করে থাকেন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যে, ওরা জবাব দিতে পারে না।'

এই মন্তব্যের ভারার্থকে অগ্রাহ্য করে ক্যাপটেন সাণ্ডার্স বিশ্লেষণ ছাড়াই। যদি

প্রিন্স হেনরী জানতে চান কি ভাবে একটি ফিল্ড কমপেনসেশান ড্রাইভ জেনারেটর কাজ করে—তখন ব্যাখ্যা করতে পারবে মিচেল। লঘু পদক্ষেপে সে হাঁটে। তারা যাত্রাপথে মাধ্যাকর্ষণের অর্ধেকটা কাজে লাগিয়েছে। এখন তারা পৃথিবীর ওপর। একটন ইটের মত ভারী মনে হয় তার নিজেকে। সে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করে। এই পথ চলে গেছে নিচে তালাবন্ধ ঘরের দিকে। তেলতেলে ঘর্ঘর শব্দে ক্যাপটেন সাণ্ডার্সের সামনে বিরাট বাঁকানো দরজার একপাশটা খুলে যায়। মুখে হাসি ফুটিয়ে সে এগিয়ে যায় টি ভি ক্যামেরার সামনে—উদ্দেশ্য হল ইংলণ্ডের রাজার আসনে যিনি বসবেন সেই উত্তরাধিকারীর সঙ্গে দেখা করা।

একদিন যিনি ইংলণ্ডের নবম হেনরী হবেন—সেই ব্যক্তিটির বয়স কুড়ির কোঠায়। তাঁর উচ্চতা স্বাভাবিক দৈর্ঘের চেয়ে সামান্য কম। বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী তাঁর আকৃতি প্রকৃত অর্থে সুগঠিত। ডালাসের লোক ক্যাপটেন সাণ্ডার্স। কোন রাজকুমারকে দেখে বিগলিত হবার লোক নয় সে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সে দেখল তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একজোড়া বড় বড় বিমর্ষ চোখ। অভ্যর্থনা এবং প্যারেড লক্ষ্য করেছেন এই চোখের অধিকারী। এই চোখের মালিক দেখেছেন বহু বিদ্ঘুটে জিনিস। এই সব অনুষ্ঠান কখনও সরকারী সতর্ক পরিকল্পনার বাইরে ছিল না। ক্লান্ত গর্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন সাণ্ডার্স এই প্রথম বুঝতে পারল রাজপরিবারের কোন ব্যক্তির প্রগাঢ় নিঃসঙ্গতা বলতে কি বোঝায়।

রাজপরিবার সম্পর্কে ক্যাপটেন সাণ্ডার্সের সমস্ত অপছন্দ হঠাৎ প্রকৃত ত্রুটির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। কারুর মাথার ওপর এত বোঝা চাপানোই হচ্ছে রাজ-মুকুটের মস্ত ত্রুটি।

সেণ্টাউরুস জাহাজের প্রবেশ পথগুলি খুব সরু। স্বাভাবিকভাবে কিছুই দেখা যায় না। ব্যাপারটা প্রিন্স হেনরীর কাছে ভালই লাগল। তাঁর পেছনে পড়ে রইল পারিষদবর্গের দল। ওরা জাহাজে যেই ঘোরাঘুরি শুরু করল—সাণ্ডার্স ব্যবহারে অনেক সহজ হয়ে ওঠে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে প্রিন্সের সঙ্গে সহজ ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকে। সে জানে না যে, রাজপরিবারের লোকজন আগেই রপ্ত করে নেন সেই কৌশল যার সাহায্যে তাঁরা মানুষদের আড়ষ্ট ব্যবহার ভেঙ্গে দেন।

সতৃষ্ণ ভঙ্গিতে প্রিন্স বলেন, 'জানেন ক্যাপটেন, আজকের দিনটা বিরাট আমাদের কাছে। সর্বদা আমার আশা ছিল একদিন ইংলণ্ড থেকে মহাশূন্যে বিমান চালানো সম্ভব হবে। এখানে আমাদের নিজস্ব একটা বন্দর হবে—ব্যাপারটা ভাবলে অদ্ভুত মনে হয়। হ্যাঁ এত বছর পরে। বলুন তো···রকেট নিয়ে কখনও ব্যাপক কাজকর্ম করছেন কী?'

'রকেট সম্পর্কে কিছু শিক্ষা নিয়েছি। কিন্তু আমি গ্রাজুয়েট হবার আগেই

রকেট অনেক এগিয়ে গেছে। আমি ভাগ্যবান ছিলাম। অনেক বয়স্ক লোকদের আবার স্কুলে যেতে হয়েছে রকেট সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে। নইলে মহাশূন্যে রকেট নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ত্যাগ করতে হোত যদি না নতুন ভাবে মহাকাশ বিমানকে সাজানো যেত।'

'ফলে পার্থক্যটা বুঝি অনেক হয়েছে?'

'হ্যাঁ। যখন রকেট চলে—ব্যাপারটা হয় খুবই বিরাট। যেমন পালতোলা নৌকো থেকে বাষ্পচালিত জাহাজের পরিবর্তন বিরাট রকমের। যাই হোক, এমন তুলনার কথা প্রায়ই আপনি শুনবেন। পুরনো রকেটে ছিল জাদু। যেমন ছিল পুরনো উইন্ডজাসারে। আধুনিক মহাকাশ বিমানে সেই জাদু নেই। সেন্টাউরুস যখন চলতে শুরু করে—বেলুনের মত নিঃশব্দে আকাশে ভেসে বেড়ায়। ইচ্ছে হলে আস্তে আস্তেও চলতে পারে। কিছু রকেট মাইলের পর মাইল বেগে চলে সশব্দে। কিন্তু প্রেরক পাটাতনের খুব কাছে থাকলে আপনি বধির হয়ে থাকবেন দিনের পর দিন। পুরনো সংবাদ থেকে আপনি সবই জানতে পারবেন।

প্রিন্স হাসলেন। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, প্রাসাদে আমি এসব দেখেছি। প্রায়ই প্রধান প্রধান অভিযানের সমস্ত ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি। রকেটের অন্তিম দশা দেখে আমি দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু স্যালিসবারির সমতলে আমাদের কখনও মহাকাশ বন্দর ছিল না। প্রচণ্ড শব্দে পাথর কেঁপে উঠত।'

'পাথর?' জিজ্ঞেস করে স্যান্ডার্স। জাহাজের পাটাতন ফাঁক করে কে হোল্ড নাম্বার থ্রি-তে নিয়ে এলো প্রিন্সকে।

'প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ। পৃথিবীর একটি অন্যতম বিখ্যাত পাথরের বৃত্ত। এই বস্তুটি বাস্তবিকই নয়ন-মুগ্ধকর। প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। যদি পারেন এই বস্তুটি দেখুন—এখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে।'

ক্যাপটেন সান্ডার্স অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখে। বড়ই অদ্ভুত দেশ! অন্য কোথাও কী এমন পার্থক্য দেখা যায়? সে মনে মনে নিজেকে বেশ তরুণ এবং অনভিজ্ঞ ভাবল। তার মনে পড়ে সুদূর দেশের বাড়ির পুরনো ইতিহাস। এবং সমস্ত টেক্সাস খুঁজলে কোথাও পাঁচশো বছরের পুরনো কোন বস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐতিহ্য বলতে কী বোঝায়—এই প্রথম যেন সে বুঝতে শুরু করে। ঐতিহ্য দিয়েছে প্রিন্স হেনরীকে এমন কিছু যা কিনা সান্ডার্স কখনও আয়ত্ত করতে পারবে না। হ্যাঁ, আত্মবিশ্বাস আর ভারসাম্য। এবং যে ভাবেই হোক, ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত অহমিকা, কারণ এটা খুবই মানানসই ব্যাপার যে, কখনও এই বস্তুটি নিজের অধিকারে জোর করে দাবী করা যায়নি।

তিরিশ মিনিট ধার্য ছিল প্রিন্স হেনরীর মহাকাশ বিমানে ভ্রমণের জন্যে। এরই মধ্যে উনি এত অসংখ্য প্রশ্ন করলেন যে, ব্যাপারটা অবাক হওয়ার মত।

সৌজন্যবশত যেমন রুটিনমাফিক প্রশ্ন করা হয়—প্রিন্সের প্রশ্নগুলি তেমন ছিল না। প্রশ্নগুলি ছিল না জবাব দেওয়ার পক্ষে বিরস। মহাকাশ বিমান সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন প্রিন্স হেনরী। পারিষদবর্গের কাছে যখন মাননীয় অতিথিকে নিয়ে ফিরে এলো ক্যাপটেন সাণ্ডার্স—তখন সে সম্পূর্ণ শান্ত। সেণ্টাউরুসের বাইরে অসীম ধৈর্যের ভান করে পারিষদবর্গের দল অপেক্ষা করছিল।

বাইরে বেরুবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেনের সঙ্গে করমর্দন করে প্রিন্স বলেন, 'ক্যাপটেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বহুদিন এমন আনন্দ পাইনি। আশা করি ইংলণ্ডে আপনার দিনগুলি ভালই কাটবে। এবং আপনার যাত্রা সফল হবে।'

এরপর অনুচরবর্গ দ্রুত নিয়ে যায় প্রিন্সকে। বন্দরের কর্মচারীরা এতক্ষণ হতাশ হয়ে অপেক্ষা করছিল, ওরা বিমানে উঠে এলো কাগজ পরীক্ষা করতে। সব কাজ শেষ হওয়ার পর মিচেল জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের প্রিন্স অফ ওয়েলস্ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'



খোলাখুলি জবাব দেয় সাণ্ডার্স, 'উনি আমাকে অবাক করেছেন। আমি কখনও ভাবিনি উনি একজন প্রিন্স। রাজপরিবারের লোকদের সর্বদাই আমি বোবা ভাবতাম। কিন্তু···অবাক কান্ড, প্রিন্স জানেন ফিল্ড ড্রাইভের নিয়ম-কানুন! উনি কী কখনও মহাকাশে ভ্রমণ করেছেন?'

'মনে হয় একবার। আবহাওয়ার কিছু ওপরে উনি গিয়েছেন মহাকাশ শক্তিবাহী বিমানে চেপে। কক্ষপথে পেঁছবার আগেই ফিরে এসেছেন উনি। কিন্তু এতেই প্রধানমন্ত্রীর প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছিল টাইম পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এবং লোকসভায়। সকলেই মনে করেছিল ঐ রকম নতুন ও অদ্ভুত কিছু অসার সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে জড়ানো সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর পক্ষে খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। রাজকীয় শক্তিবাহী মহাকাশ বিমান-বাহিনীতে যদিও প্রিন্সের পদ ছিল সবচেয়ে উঁচুতে—তিনি কখনও চাঁদে যান নি।'

ক্যাপটেন সাণ্ডার্স বলে, 'বেচারা!'

তিনদিন সময় ছিল উত্তপ্ত হওয়ার পক্ষে সেন্টাউরুসের। বিমানে মালতোলা দেখাশুনা করার কাজ নয় ক্যাপটেনের। অথবা ওড়ার আগে রক্ষণাবেক্ষণ করা। কর্মরত ইঞ্জিনীয়ারদের কাঁধের ওপর যারা ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে এমন নাবিক-

দের জানত সাণ্ডার্স। ওদের মত সে নয়। তাছাড়া, সে চেয়েছিল লণ্ডন শহরকে দেখতে। সে আগে গিয়েছে চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে এবং শুক্রগ্রহে। কিন্তু এবার সে প্রথমবার এসেছে লণ্ডনে। এই শহর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খবর তাকে জানিয়েছে মিচেল এবং চেন্সর্ক। ওরা নিজেদের পরিবারের কাছে যাওয়ার আগে লণ্ডনে যাওয়ার জন্যে সাণ্ডার্সকে মনোরেলে উঠিয়ে দিয়েছিল। সাণ্ডার্স ফিরে আসার একদিন আগে ওরা মহাকাশ বন্দরে উপস্থিত থাকবে সবকিছু ঠিকঠাক দেখাশুনার জন্যে। সন্দেহমুক্তভাবে এমন অফিসারদের ওপর নির্ভর করা সাণ্ডার্সের পক্ষে বিরাট স্বস্তিকর ব্যাপার। ওরা সতর্ক এবং কল্পনাহীন। কিন্তু নির্ভয়ে ওদের এগিয়ে যাওয়ায় প্রায় কোন ভুল থাকে না। ওরা যদি বলে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে—সাণ্ডার্স জানে, কোনরকম সংশয় ছাড়াই মহাকাশ বিমান ছাড়তে পারে।

স্থলভাগের সুন্দর দৃশ্যাবলীকে ভেদ করে মসৃণ স্তম্ভকটি পেরিয়ে যাচ্ছে। ভূমির খুব কাছাকাছি এসে স্তম্ভকটি দ্রুতবেগে ছুটছে। ফলে শুধুমাত্র অপসৃয়মান শহর এবং মাঠ ঘাটের দৃশ্য চকিতে চোখে পড়ে। সাণ্ডার্সের মনে হল সব কিছুই বিস্ময়করভাবে আঁটসাঁট। এবং সব কিছু দেখাচ্ছে লিলিপুটের মত। খালি জায়গা কোথাও নেই। কোনদিকে এক মাইলের বেশি মাঠ চোখে পড়ছে না। এতেই অস্বাভাবিক আতংক জাগার পক্ষে যথেষ্ট একজন টেক্সাসবাসীর পক্ষে। বিশেষ করে সেই ব্যক্তিটি যদি আবার মহাশূন্যের পাইলট হয়।

দিগন্তে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা নগরের মত লণ্ডনকে মনে হচ্ছে সঠিকভাবে তীক্ষ্ম। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অট্টালিকাগুলি নিচু। সম্ভবত উচ্চতায় এগুলি ষোল অথবা একুশ তলা। সরু গভীর খাদের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মনোরেল। কাছেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা পার্ক। কাছেই নদী। মনে হয় টেমস্ নদী। তারপর প্রবলবেগে আন্দোলিত হয়ে মনোরেল গতি কমিয়ে দেয়। ঘোষণা শোনা যায় লাউডস্পীকারে। লাজুক কণ্ঠস্বর। ভয় পাচ্ছে যেন আড়ি পেতে কেউ না শোনে। 'এটা হচ্ছে প্যাডিংটন। উত্তরের যাত্রীরা দয়া করে যে-যার সিটে বাসে থাকুন।' ওপরের র‍্যাক থেকে লগেজ নামিয়ে সাণ্ডার্স স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায়।

মাটির তলায় প্রবেশের মুখে একটা বুকস্টল চোখে পড়ে সাণ্ডার্সের। অনেক সুদৃশ্য ম্যাগাজিন রয়েছে। অর্ধেকের বেশি পত্র-পত্রিকার মলাটে ছবি ছাপা হয়েছে প্রিন্স হেনরী অথবা রাজপরিবারের অন্য কারুর। সাণ্ডার্সের মনে হল এ ব্যাপারটা বেশি বাড়াবাড়ি। সান্ধ্য দৈনিকের পাতায় প্রিন্স হেনরীর ছবি। উনি সেণ্টাউরুসে ঢুকছেন অথবা বেরিয়ে আসছেন। কয়েকটি পত্রিকা কেনে সাণ্ডার্স। টিউবরেলে ভ্রমণের সময় কাগজগুলি পড়া যাবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে একঘেয়েমি লক্ষ্য করা যায় কাগজগুলিতে। অবশেষে ওরা

সন্তোষ প্রকাশ করেছে। মহাকাশ-বিজয়ে অন্যান্য দেশের চেয়ে ইংলণ্ড আর পেছনে পড়ে থাকবে না। লক্ষ লক্ষ মাইল মরুভূমি ছাড়াই এখন সম্ভব মহাশূন্যে ক্ষিপ্রগতি বিমান চালানো। প্রয়োজন হলে আজকের নিস্তব্ধ, মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে মহাকাশ বিমান হাইড পার্কে নামতে পারে। সর্পিল উভচর বিমানকে কোনরকম বাধার মুখোমুখি হতে হবে না।
মহাকাশে যুগেও এমন ধরনের স্বাদেশিকদের কথা ভেবে সাণ্ডার্স অবাক হয়। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল খুব ব্রিটিশদের কাছে। ওরা মহাশূন্যে বিমান প্রেরণের উপযোগী জায়গার জন্যে হাত পেতেছিল অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং রাশিয়ার কাছে।
দেড় শতাব্দীর পরে এখনও লণ্ডনের মাটির তলার অবস্থা অর্থাৎ যানবাহন ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। প্যাডিংটন ছাড়ার পর দশ মিনিটের মধ্যে সাণ্ডার্স তার গন্তব্যস্থানে পেঁছে যায়। দশ মিনিটে সেণ্টাউরুস্ পঞ্চাশ হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু মহাশূন্যে এখানকার মত ভিড় নেই। অসরল রাস্তা ধরে হেঁটে সাণ্ডার্স হোটেলে পেঁছায়। মহাশূন্যে কিন্তু এমন ব্যাপার নেই। লন্ডনের রাস্তাঘাটকে সরল করার সমস্ত প্রচেষ্টা দুঃখজনক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পনেরো মিনিট আগে সে শেষ একশো গজ পথ পেরিয়েছে।



পোশাক ছেড়ে সাণ্ডার্স বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিজের জন্যে আছে চিন্তাশূন্য তিনদিন। ব্যাপারটা যেন সত্যি বলে ভাবাই যায় না!
তাই হল। অর্থাৎ সবে মাত্র আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলেছে সাণ্ডার্স অমনি ফোন বেজে ওঠে।
'ক্যাপটেন সাণ্ডার্স? খুবই আনন্দের ব্যাপার…আমরা আপনার খোঁজ পেয়েছি। বি বি সি থেকে কথা বলছি। আমরা একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছি, বিষয় হল—'আজ রাত্রে শহরে।' এবং আমরা ভাবছি…।'
বাতাস-বন্ধ-করা দরজায় শব্দ হয়। এমন মিষ্টি শব্দ সাণ্ডার্স বহুদিন শোনেনি। এখন সে নিরাপদ। এই সুরক্ষিত দুর্গে কেউ তাকে ধরতে পারবে না। শীঘ্র মহাকাশ বিমান মহাশূন্যে উড়ে যাবে। এমন নয় যে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। বরং খুবই ভাল অভ্যর্থনা সে পেয়েছিল। চারবার (অথবা পাঁচবার কী?) টিভির বহু অনুষ্ঠানে তাকে দেখা গেছে। তার মনেও নেই

কত পার্টিতে সে যোগদান করেছিল। অনেকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে (যে ভাবে তার মাথা ঘুরছে) এবং পুরনো বন্ধুদের কথা তার মনে নেই।

বন্দরে মিচেলের সঙ্গে দেখা হতেই সাণ্ডার্স বলে, 'গুজব আমরাই ছড়িয়েছিলাম যে, ব্রিটিশরা নাকি গম্ভীর ধরনের? আমার সঙ্গে কিন্তু ঐ ধরনের কোন ব্রিটিশের দেখা হয় নি।'

জবাবে মিচেল বলে, 'মনে হচ্ছে আপনার সময়টা বেশ কেটেছে।'

সাণ্ডার্স বলে, 'কালকে এ সম্পর্কে বলবেন। কাল হয়ত আমার মনের অবস্থা ঠিকঠাক হয়ে উঠবে।'

চেম্বার্ক বলে, 'গতকাল রাত্রে টিভিতে অদ্ভুত অনুষ্ঠানে আপনাকে লক্ষ্য করেছি। আপনাকে ঠিক মৃতবৎ দেখাচ্ছিল।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আমার এধরনের সহানুভূতিসূচক উৎসাহের প্রয়োজন। ভোর তিনটের সময় জেগে ওঠার পর আপনি চিন্তা করে দেখবেন, শুষ্কতার কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পান কিনা।'

চেম্বার্ক সঙ্গে সঙ্গে জবাবে বলে, 'নীরস'।

'বিস্বাদ।' মিচেল বলে। সে পিছিয়ে থাকতে চায় না।

'আপনি জিতে গেলেন। এখন আমাদের কর্মসূচী ঘুরে-ফিরে দেখা দরকার। ইঞ্জিনীয়াররা কী করছে, দেখা যাক।'

নিজের টেবিলে বসে ক্যাপটেন সাণ্ডার্স তাড়াতাড়ি তার নিজের কর্মদক্ষতা ফিরে পায়। আবার সে তার নিজের বাড়িতে গিয়েছিল। তার ট্রেনিং সমাপ্ত। ঠিক কি করা দরকার সে জানে। কাজ করবে সে যন্ত্রের মত নির্ভুল। তার ডান এবং বাম দিকে বসে মিচেল ও চেম্বার্স তাদের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছে। কণ্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলছে ওরা।

মহাশূন্যে ওড়ার আগে ওদের এক ঘণ্টা লাগে খুঁটিনাটি পরীক্ষার জন্যে। শেষ নির্দেশের ওপর যখন সই করা হয় এবং মনিটর প্যানেলের শেষ লাল আলো যখন সবুজে পরিণত হয়ে ওঠে—তখন সিটে হেলান দিয়ে বসে সাণ্ডার্স একটা সিগারেট ধরায়। বিমান ছাড়ার আগে তাদের হাতে আছে দশ মিনিট।

সাণ্ডার্স বলে, 'একদিন আমি ইংলণ্ডে যাব অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তির মত। দেখবো ওই শহরের আসল আকর্ষণ কোথায়। বুঝি না একটা ছোট্ট দ্বীপ জলের তলায় না ডুবে কিভাবে এত লোককে বুকের ওপর ধরে রেখেছে।'

ঘোড়ার মত নাক নেড়ে চেম্বার্স বলে, 'হলাণ্ডকে আপনার দেখা উচিত। ওই দেশের তুলনায় ইংলণ্ড তো টেক্সাসের মত বড়।'

'তারপর ধরুন এই রাজপরিবারের ব্যাপার। জানেন আপনি···যেখানেই গেছি, লোকে জিজ্ঞেস করেছে—প্রিন্স হেনরীকে আমার কেমন লেগেছে, আমাদের মধ্যে কি কি কথাবার্তা হয়েছে, প্রিন্স হেনরীকে আমার কি চমৎকার মানুষ মনে হয়

না এবং এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন। বিশ্বাস করুন, এই ধরনের কথাবার্তা আমাকে ক্লান্ত করেছে। বুঝতে পারি না, আপনারা এ'সব জিনিষ হাজার বছর ধরে কিভাবে সহ্য করেছেন।'

মিচেল জবাবে বলে, 'সব সময় যে রাজপরিবারের ব্যক্তিরা জনপ্রিয় ছিলেন, মোটেও ভাববেন না। চারলস্ দি ফার্স্টের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, মনে আছে? আর প্রথমদিকের জর্জদের সম্পর্কে আমরা এমন কিছু বলেছি যা রীতিমত রুক্ষ—আপনারাই পরে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন।'

চেম্বার্স বলে, 'ঐতিহ্যকে আমরা পছন্দ করি। প্রয়োজন মত আমরা পরিবর্তনকে মেনে নিত্যে ভয় পাই না। কিন্তু রাজ পরিবারের ব্যাপারে…ওঁরা অসামান্য এবং আমরা ওঁদের পছন্দ করি। যেমনভাবে আপনি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেন।'

'খুব একটা সঙ্গত উদাহরণ দিলেন না কিন্তু। স্তম্ভের ওপর মানুষের মূর্তি বসানো এবং তাদের প্রতি এমন ব্যবহার…এটা ঠিক নয় বলেই মনে করি…হুঁ, ওঁদের ছোটখাট ঈশ্বর বলে ভজনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে প্রিন্স হেনরীর দিকে তাকান। উনি যা বাস্তবিকই করতে চান, আপনি কী মনে করেন, প্রিন্স হেনরীর সেই সব কাজ করার সুযোগ হবে? লণ্ডনে থাকাকালীন ওঁকে আমি তিনবার টিভিতে দেখেছি। প্রথমবার দেখা গেল উনি কোথায় যেন একটা স্কুলের উদ্বোধন করছেন। তারপর তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় সমবেত মৎস্য-বিক্রেতাদের কাছে ভাষণ দিচ্ছেন গিল্ডহলে (শপথ করে বলছি, আমি ওই ভাষণ বুঝতে পারিনি)। সব শেষে দেখা যাচ্ছে তিনি অভ্যর্থনা পাচ্ছেন পোডাঙ্কের মেয়রের কাছ থেকে। 'মনে হয় ওই রকম জীবনযাপনের চেয়ে আমি জেলে পচে মরবো! কেন আপনারা ওই বেচারাকে একলা থাকতে দিচ্ছেন না?'

চেম্বার্স অথবা মিচেল—ওরা এই আহ্বানে সাড়া দেয় না। বরং ওরা প্রাণহীন ভাবে চুপ করে থাকে। সাণ্ডার্স মনে মনে ভাবে ওর লাম্বাচওড়া কথা বলা উচিত হয়নি। এখন আমি ওদের মনে আঘাত দিয়েছি। কোথায় যেন একটা উপদেশ আমি পড়েছিলাম—ওটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল—'ব্রিটিশদের আছে দুটি ধর্মবিশ্বাস—ক্রিকেট এবং রাজপরিবারের প্রতি। কখনও এর একটিরও সমালোচনা করবেন না।'

রেডিও এবং মহাকাশ বন্দরের নিয়ন্ত্রণকারীর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত নীরবতা ভেঙ্গে যায়।

'সেণ্টাউরুসের নিয়ন্ত্রণকারীকে বলা হচ্ছে। আপনার বিমানের ওড়ার পথ পরিষ্কার।'

প্রধান সুইচ টিপে সাণ্ডার্স বলে, 'ছাড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে…এখনই!' তারপর

সে হেলান দিয়ে বসল। ওর চোখ ঘুরে যায় সমস্ত কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর দিয়ে। বোর্ডের ওপর থেকে সে হাত উঠিয়ে নিল। কিন্তু যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত থাকে।
একটু উত্তেজিত হলেও নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে সান্ডার্সের। এখন সেণ্টাউরুসের দেখাশুনা করছে ওরা অর্থাৎ ধাতু এবং উৎকৃষ্ট কাঁচের তৈরী মস্তিস্করা। এবং ইলেকট্রনের প্রজ্বলিত আলোকধারা। প্রয়োজন হলে সান্ডার্স নিজেই পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু সে কখন নিজের হাতে মহাকাশ বিমানকে ওপরে তোলেনি। এবং এ'কাজ করবে বলে আশা করেনি। যদি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির গণ্ডগোল দেখা যায়—সান্ডার্স টেক্-অফ্ বাতিল করবে। পৃথিবীর ওপর বসে থাকবে যতক্ষণ না যন্ত্রপাতির ভুল ত্রুটিগুলি শোধরানো না হয়।



সেণ্টাউরুসের ভার হ্রাস পেতে থাকে। আকর্ষণ পুনরায় বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের আর্তনাদ ওঠে মহাকাশ বিমানের কাঠামো থেকে। অবতরণ স্থানে বাঁকানো বাহুতে এখন আর ভার নেই। বাতাসের সামান্য চাপে আকাশে উড়ে যাবে বিমান।
টাওয়ার কন্ট্রোল থেকে শব্দ ভেসে এলো—'এখন আপনাদের মহাকাশ বিমানের ওজন শূন্য। ব্যাসের আয়তন-নির্ধারণ পরীক্ষা করুন।'
পরিমাপক-যন্ত্রের দিকে তাকায় সান্ডার্স। উন্মুক্তস্থানের উর্ধ্বগতি এখন মহাকাশ বিমানের ওজনের ঠিক সমান সমান। এবং মোট ভরের সঙ্গে মিলে যাবে পরিমাপক-যন্ত্রের গণনা। পরীক্ষার ফলে ধরা পড়ে ভাড়া ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে আছে এমন একটা লোককে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে মহাকাশ বিমানের ডেকে। পরিমাপক-যন্ত্র খুবই অনুভূতিশীল।
বাষ্পের চাপ-নির্দেশক যন্ত্র থেকে পড়তে থাকে সান্ডার্স—'এক লক্ষ, পাঁচ শো ষাঠ হাজার, চারশো এবং কুড়ি কিলোগ্রাম। খুব ভালো। পরীক্ষায় মনে হল পনেরো কিলোগ্রামে আসতে পারে। এই প্রথমবার আমার ওজন কম হল। মিচ্, পোর্ট লোয়েলে আপনার মোটা বান্ধবীর জন্যে আপনি আরও অনেক ক্যান্ডি (চিনির মিঠাই) নিতে পারেন।'
সহকারী পাইলট উত্তরে অসুস্থভাবে দাঁত বের করে। মঙ্গলগ্রহে সে কখনও

অন্ধভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি। ফলে ওর অনিশ্চিত খ্যাতি আছে স্বর্ণাভ রমণীদের প্রতি আসক্তির।

গতির অনুভূতি নেই। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের আকাশে উড়ছে সেণ্টাউরুস। ওর ওজনই শুধু নষ্ট হয়নি উভয় দিকে ব্যবহারের উপযোগীও করে তোলা হয়েছে। নিচের দর্শকদের কাছে সেণ্টাউরুসকে দ্রুতবেগে চলা তারার মত মনে হবে। যেন মেঘের মধ্যে ধাবমান রুপোর গুলি। মহাকাশ বিমানের চারপাশে নীল আবহাওয়া গাঢ়তর হচ্ছে সনাতন অন্ধকারে। যেন অদৃশ্য তারের বরাবর চলেছ একটি পুঁতির মালা। রেডিও তরঙ্গকে অনুসরণ করে মহাকাশ বিমান চলছে। এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে চলতেই থাকবে।

পৃথিবী থেকে এইবার নিয়ে ছাব্বিশবার মহাকাশ বিমান টেক্-অফ্ করল সে—ভাবে সাণ্ডার্স। কিন্তু টেক্-অফের বিস্ময় কখনও মুছে যায় না। কন্ট্রোল প্যানেলে থাকার সময় যে শক্তি সে টের পায়—সেই অনুভূতিও কমে না। এমন শক্তি মনুষ্য জাতির পুরনো দেবতারা কখনও স্বপ্নে ভাবেনি। কখনও দু'বার প্রস্থান এক অনুভূতি নিয়ে আসেনি। কখনও ওড়া হয়েছে প্রভাতে। কখনও সূর্যাস্তের সময়। কখনও মেঘাবৃত পৃথিবীতে। কখনও পরিষ্কার এবং সূর্যালোকিত আকাশে। মহাশূন্য হয়ত অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু পৃথিবীতে একই প্যাটার্ণ কখনও পুনরায় ঘটে না। এবং কোন মানুষ কখনও একই স্থলভাগের দৃশ্য দেখে না অথবা একই আকাশ। নিচে চিরকালের মত বয়ে চলেছে ইয়োরোপের দিকে আটলাণ্টিকের স্রোত। এবং ইয়োরোপের ওপরেও। কিন্তু সেণ্টাউরুসের নিচে! একই বাতাসের আগে আগে চলেছে ঝকমকে মেঘের দল। মহাদেশে মিলে যাচ্ছে ইংলণ্ড। এবং ইয়োরোপের তটরেখা হয়ে উঠছে ক্রমশ ক্ষুদ্র এবং কুয়াশাছন্ন। বক্র পৃথিবীর খোসা ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশে আমেরিকার প্রথম চিহ্ন দেখা যাচ্ছে দিগন্তের ক্ষণস্থায়ী রঙে। এক দৃষ্টিপাতে ক্যাপটেন সাণ্ডার্স সামনের সমস্ত দৃশ্য জরীপ করল। দেড় হাজার বছর আগে কলম্বাস এ'স্থান আবিষ্কারের জন্যে শ্রমসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

নিস্তব্ধ অসীম শক্তির বলে মহাকাশ বিমান পৃথিবীর শেষ মায়া ত্যাগ করে আরও ওপরে ওঠে। বাইরের একজন দর্শকের কাছে উদ্যমের একমাত্র চিহ্ন দেখা যাবে মহাকাশ বিমানের চারপাশে বিষুবরেখার লাল বিকিরণ থেকে। পিণ্ড থেকে শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

লগবুকে পরিষ্কার ভাবে লিখতে থাকে ক্যাপটেন সাণ্ডার্স—'১৪ঃ ০৩ঃ ৪৫'। 'পলায়নপর বেগ অর্জিত হচ্ছে। বিচ্যুতির গতি সামান্য।'

লগবুকে লিখতে লিখতে সাণ্ডার্সের মনে হয় ছোট্ট একটা ব্যাপার আছে। ঘণ্টায় পঁচিশশো মাইল অতিক্রম প্রায় অলভ্য ছিল প্রথম মহাকাশযাত্রীর কাছে। এখন

তার বস্তুত কোন গুরুত্ব নেই। সেণ্টাউরুস এখনও এগিয়ে চলেছে। ওরা চলার শক্তি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেড়ে যাবে। কিন্তু এর একটা গভীর মনস্তত্বীয় অর্থও রয়েছে। এই মুহূর্তে যদি শক্তি হ্রাস পায়—ওদের ফিরে যেতে হবে পৃথিবীতে। কিন্তু এখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখনও আবার ধরে রাখতে পারবে না। ওরা মহাশূন্যের স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং ওরা গ্রহমণ্ডলের কোন জায়গা নির্বাচন করতে পারে।

বাস্তবে মঙ্গলগ্রহ নির্বাচন না করলে অনেক বিপদের মুখে ওরা পড়বে। এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের মাল খালাস করতে হবে। সমস্ত মহাশূন্য-যাত্রীর মত ক্যাপটেন সাণ্ডার্সও রোমাণ্টিক। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও সে অনেক সময় স্বপ্ন দেখে এবং গর্ব হয় শনিগ্রহের ঔজ্বল্যে অথবা রোমক সমুদ্র-দেবতার ধ্বংসে। দূরে সংকুচিত সূর্য জ্বলছে।

পবিত্র অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী টেক্অফের এক ঘণ্টা পরে চেম্বার্স কমপিউটারকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়। চার্ট টেবিলের নিচ থেকে বের করে আনে তিনটি গ্লাস। ঐতিহ্যকে স্মরণ করে সে নিউটন, ওয়ার্থ এবং আইনষ্টানের সম্মানার্থে মদ্য পান করতে থাকে। কিভাবে এই সামান্য উৎসবের উৎপত্তি হয়েছিল—অবাক হয়ে ভাবে সাণ্ডার্স। অন্তত ষাট বছর যাবত এই উৎসব পালন করছে মহাশূন্যের নাবিকরা। এর উৎস হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে পৌরাণিক রকেট ইঞ্জিনীয়ারের উক্তি থেকে—'ছারপোকায় ভরা একটা পানশালায় তোমার মত কপর্দকশূন্য হওয়ার চেয়ে আকণ্ঠ মদিরতায় আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি ষাট সেকেণ্ড।'

দু'ঘণ্টা পরে পৃথিবীর ওপর শেষ গতি নির্দেশ সরবরাহ করা হল কমপিউটারের মধ্যে। এখন থেকে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা নিজেদের গতিতে চলতে থাকবে। নিঃসঙ্গ চিন্তা তবুও কৌতূহলজনক ভাবে উল্লাসজনক। ব্যাপারটা সাণ্ডার্স মনে মনে আস্বাদন করতে থাকে। এখানে ওরা মাত্র তিনজন। মাইল ব্যাপী আর কেউ নেই।

এই পরিস্থিতিতে কেবিনের দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ হয়। এটম বোমা ফাটলেও এত চমকে উঠত না সাণ্ডার্স। সে আঁতকে ওঠে। নিজেকে সংযত করতে পারে না। সে সিট থেকে উঠে কিছুটা এগিয়ে যায়। কিন্তু মহাকাশ বিমানের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওকে টেনে আনে পেছনে। অন্যদিকে চেম্বার্স এবং মিচেল ঐতিহ্যগত ব্রিটিশদের মত আচরণ করতে থাকে। ওরা সিটে বসে ঘুরতে থাকে। বিস্ফারিত চোখে দরজার দিকে তাকায়। তাদের ক্যাপটেন কি করে এমন পরিস্থিতিতে—সেই অপেক্ষায় থাকে ওরা।

নিজেকে সংযত করতে অনেক সেকেণ্ড লাগে সাণ্ডার্সের। স্বাভাবিক সংকটের মুখোমুখি যদি সে হোত, ইতিমধ্যেই সাণ্ডার্সের কাজকর্ম অসম্পূর্ণ হয়ে উঠতো

মহাশূন্যে। কিন্তু কন্ট্রোল কেবিনের ওপর শব্দটাই সন্দেহজনক। সে ছাড়া আর সবাই বসে আছে ওর পাশে। পরীক্ষার জন্যে এই শব্দটা নিরপেক্ষ নয়। ভাড়া ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে থাকা লোকটাই কি…অসম্ভব ব্যাপার। এ ব্যাপারে বিপদ ছিল স্পষ্ট। বাণিজ্যিক কারণে মহাকাশ বিমান আকাশে ওড়ার শুরুতেই ভাবা হয়েছিল এ ব্যাপারটা। এর বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছিল। মাল তোলার সময় সর্বদা ডিউটিতে ছিল ওর একজন অফিসার—ঐ ব্যাপার জানত সান্ডার্স। অলক্ষ্যে কেউ বিমানে ঢুকতে পারেনি সম্ভবত। তারপর ছিল বিমান ছাড়ার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করা। ঐ কাজ করেছে ওরা দুজনে—মিচেল এবং চেম্বার্স। তারপর টেক্-অফের পূর্ব মুহূর্তে ওজন পরীক্ষা করা। ওটা ছিল চূড়ান্ত। উহুঁ, ফাঁকি দিয়ে কেউ…।

আবার দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হয়। ক্যাপটেন সান্ডার্স হাতের মুঠি পাকিয়ে তোলে। তার চোয়াল সমান হয়। সে ভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কোন বোকা লোক উচিত শিক্ষা পাবে।



সান্ডার্স রাগে গর্‌গর্‌ করে বলে, 'মিঃ মিচেল, দরজা খুলুন।'

মিচেল লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। কেবিন পেরিয়ে সে পাটাতন সরিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা মলে না। তারপর ভাড়া ফাঁকি দেওয়া লোকটা মাধ্যাকর্ষণের নিচুতে টলমল করতে করতে কেবিনে প্রবেশ করে। ওকে একটুও অপ্রস্তুত দেখায় না। অত্যন্ত খুশি দেখায় ওকে।

সে বলে, 'গুড আফটার নুন, ক্যাম্পটেন সান্ডর্স। হঠাৎ অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি অবশ্যই ক্ষমা চাইবো।'

অতিকষ্টে নিজেকে সামলায় সান্ডার্স। সরু করাতের টুক্‌রোগুলি নিচে পড়ে যায়। তখন প্রথমে মিচেলের দিকে তাকায় সান্ডার্স পরে চেম্বার্সের দিকে। ওরা দুজনে নিরীহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে। ওদের ভাব-ভঙ্গিতে অপরাধের কোন রকম চিহ্ন নেই।

'হুঁ, এই ব্যাপার বুঝি!' তিক্তগলায় বলে সান্ডার্স। আর কোন রকম ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সবকিছু এখন পরিষ্কার। জটিল আলোচনার ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মধ্য রাতে মিটিং, ভুল রেকর্ড, অপ্রয়োজনীয় মালের তাড়াতাড়ি মহাকাশ বিমানে তোলা—ওর অগোচরে এসব ঘটেছে। এসব কাজ

করেছে ওর দুই বিশ্বাসী সহকর্মী। খুবই চমৎকার ব্যাপার! এসব ব্যাপার এখন শুনতে চায় না সাণ্ডার্স। সে ভাবতে থাকে, এসব ক্ষেত্রে মহাশূন্যের আইন কী ব্যবস্থা নিতে পারে? যদিও সে বিমর্ষ মনে বুঝেছে ওসব আইন-ফাইন তার কোন কাজে লাগবে না এখন।

এখন পিছিয়ে যাওয়ারও সময় নেই। ষড়যন্ত্রকারীরা এব্যাপারে প্রাথমিকভাবে ভুল গনণা করবে না। তার জীবনে এবারের যাত্রা মনে হচ্ছে বেশ গোলমেলে। সাণ্ডার্স ভাবে…সতর্কভাবে তাকে ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে হবে।

সাণ্ডার্স চেষ্টা করছিল কিছু বলার জন্যে। তখন রেডিয়োর বোর্ডে জ্বলে ওঠে জরুরী সিগনাল। ভাড়া ফাঁকি দেওয়া লোকটি নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। সে বলে, 'এমন জরুরী সিগনালের আমি আশা করেছিলাম। সম্ভবত প্রধান মন্ত্রী কিছু বলতে চান। মনে হয় হতভাগ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত।'

সাণ্ডার্সেরও তাই মনে হয়। সে বলে, 'ঠিক আছে…ইওর রয়াল হাইনেস।'

মনে মনে খুব রেগে যায় সাণ্ডার্স। মুখ দিয়ে ওর কথাগুলি এমনভাবে বেরিয়ে এসেছিল যে, অপমানের মত শোনায়। হাল ছেড়ে সে কেবিনের এক কোণে চলে যায়।

হ্যাঁ, প্রধান মন্ত্রীই সিগনাল করেছেন। ওঁকে খুবই বিপর্যস্ত মনে হয়। বহু-বার উনি বলেন, 'জনসাধারণের প্রতি আপনার কর্তব্য…।' একবার পরিষ্কার ভাবে তাঁর মুখ থেকে শোনা যায়, 'রাজমুকুটের প্রতি আপনার প্রজাদের নিষ্ঠা…।'

অবাক হয়ে সাণ্ডার্স ভাবে—প্রধানমন্ত্রীর কথায় কোন ভান নেই।

এ ধরনের ভাবালু বক্তৃতা চলতে থাকে। একটু ঝুঁকে সাণ্ডার্সের কানে কানে মিচেল ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'উনি কাদায় পা ফেলেছেন। এবং উনি জানেন ব্যাপারটা। ঘটনা শোনার পর জনসাধারণ প্রিন্স হেনরীর পেছনে দাঁড়াবে। সকলেই জানে প্রিন্স হেনরী মহাশূন্যে ভ্রমণের জন্যে চেষ্টা করছিলেন।'

সাণ্ডার্স বলে, 'উনি যা খুশি মনে করুন…শুধু আমাদের মহাকাশ বিমানে যদি না উঠতেন…। আমি ঠিক জানি না, এ ব্যাপারটাকে বিদ্রোহ বলা যায় কিনা।'

'ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। এ গণ্ডগোল যখন সম্পূর্ণ মিটে যাবে…আমার কথা মন দিয়ে শুনুন—আপনিই হবেন একমাত্র টেক্সান যাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হবে। ব্যাপারটা খুব সুন্দর লাগছে না আপনার কাছে?'

'চুপ!' চেম্বার্স বলে। প্রিন্স কথা বলছেন। ওঁর কথাগুলি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে অনেক দূরে। সেই দ্বীপ থেকে এখন তিনি বিযুক্ত। একদিন ওই দ্বীপের ওপর তাঁর শাসন কায়েম হবে।

প্রিন্স বলেন, 'মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, আমি আপনার মনে ভীতি উদ্রেকের জন্যে দুঃখিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসবো। প্রথমবারের জন্যে কাউকে কিছু করতে হয়। আমার মনে হয়েছিল আমাদের রাজপরিবারের কাউকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়েছে। মহাশূন্যে যে আমি এসেছি এ ব্যাপারটা হবে আমার শিক্ষার মূল্যবান অংশ। ফলে কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে আমি আরও উপযুক্ত হয়ে উঠবো। এখন বিদায় !'
মাইক্রোফোন রেখে প্রিন্স হেনরী পর্যবেক্ষণ-জানলার কাছে এগিয়ে যান। সমস্ত মহাকাশ বিমানে কেবল এখান থেকে মহাকাশ বন্দর দেখা যায়।



সাণ্ডার্স দেখল প্রিন্স হেনরী একাকী গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। এখন উনি সুখী। তারাদের লক্ষ্য করছেন প্রিন্স হেনরী। অবশেষে তাঁর আকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছে। আস্তে আস্তে সাণ্ডার্সের মন থেকে বিরক্তি আর ঘৃণা উবে যায়। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। তখন বন্দর থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রিন্স হেনরী ক্যাপটেন সাণ্ডার্সের দিকে তাকিয়ে হাসেন। জিজ্ঞেস করেন, 'ক্যাপটেন, রান্নার জায়গা কোথায় ? হয়ত আমার এখন অভ্যেস নেই কিন্তু যখন আমি নিয়মিত স্কাউটিংয়ে যেতাম, আমার দলে আমি ছিলাম সবচেয়ে দক্ষ পাচক।'
হাসি ফিরিয়ে দেয় সাণ্ডার্স। মনে মনে সে হালকা বোধ করে। মনে হয় কন্ট্রোল রুমে আর উত্তেজনা নেই। মঙ্গলগ্রহ এখনও অনেক দূরে···যাই হোক, যাত্রাটা মোটের ওপর তেমন কিছু খারাপ হবে না···।

অনুবাদ ঃ সুভাষ সিংহ

আইজাক অ্যাসিমভ

বিশ্বাস এবং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলো যত সহজবোধ্য হবে ততই তা হয়ে উঠবে জনপ্রিয়। অতি সাধারণ মানুষও তখন ভাবতে শিখবেন, তাঁরা হয়ে উঠবেন অনুসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ সুস্থ সুসংম্ধ জীবন যাপনের সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে পারবেন।

পৃথিবীতে বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখি নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে যাঁর নাম পড়ে তিনি হচ্ছেন আইজাক অ্যাসিমভ। তিনি মনে করেন বিজ্ঞানকে সহজ করে পরিবেশন করার অর্থ পৃথিবীর মঙ্গল করা।

অ্যাসিমভ জন্মগ্রহণ করেন রাশিয়ায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেখানে তিনি থাকতে পারেননি। জন্মগ্রহণের তিন বছর পরে তাঁকে তাঁর জন্মস্থান ছেড়ে বাবা মা'র সঙ্গে আমেরিকায় এসে বসবাস করতে হয়। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর পড়াশোনা। তিনি কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেন। অ্যাসিমভ রসায়ন নিয়ে ডক্টরেট হন ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ত্রয়োদশ বিশ্ববিজ্ঞান কনভেনশন হয় তিনি হয়েছিলেন তাঁর সম্মানিত অতিথি।

যে বই প্রথম অ্যাসিমভের জীবনে পুরস্কার এনে দেয় তার নাম মারুনেভ অফ ভেস্তা। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরস্কার পান অ্যাসিমভ। এই মুহূর্তে লেখকের বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশী। তিনি রোবটিয় তিন সূত্রের জনক। তাঁর রোবট সম্পর্কীয় গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে আই রোবট এবং রেষ্ট অফ দি রোবটস্ বইয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় অ্যাসিমভ ফিলাডেলফিয়ায় বৈমানিক সৈন্য গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেছিলেন। এবং যুদ্ধ শেষে তিনি যুক্ত রাজ্যের সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ও তিনি তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাসিমভ প্রথম হুগো পুরস্কার পান তাঁর দি বেষ্ট অল টাইমস্ সিরিজ বইয়ের জন্য। লেখকের এই সিরিজের বইগুলো বিশ্বাস জগতের

এক অমূল্য সংযোজন। অ্যাসিমভ তিনবার হুগো পুরস্কার পেয়েছেন। এরপর ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে নেবুলা পুরস্কার পান তাঁর দি গডস্ দেমসেলভস্ বইয়ের জন্য।

বিজ্ঞান ছাড়াও অ্যাসিমভ সময় উপযোগী বহু ভ্রমণ ও নাটক লিখেছেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি বর্তমানে সহজ বিজ্ঞান লেখায় নিযুক্ত। তাঁর অসংখ্য সম্পাদিত বই সাহিত্যের এক বিশেষ সংযোজন।



টোনি

সামনের দরজায় অতিথির আগমন বার্তা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে আসে ডক্টর শান্তা করের পরিচিত মুখ, দীপকের অফিসে বড় গোছের অফিসার, রোবট মনোবিজ্ঞানী বা ঐ ধরনের জন কিছু। আর তার পাশে টোনি। হ্যাঁ, দীপক সেই নামই বলেছিলো ; মডেল ট. ন. ই.—৩, আর তার থেকেই টোনি। লম্বা, চোখ ধাঁধানো সুপুরুষ, খোদাই করা গ্রীক দেশীয় রূপ আর কেমন যেন অপার্থিব সুরুচি দিয়ে ঘেরা। বিস্ময় মেশানো ভীত চোখে চেয়ে দেখে কাজল বসু।

না দীপ, ওকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারবো না। প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে কাজল। "না" বলার পেছনে একটা যুক্তি খুঁজতে থাকে অসহায় ভাবে। শেষে বলে ওঠে, যাকগে, মোট কথা ওর থাকা চলবে না এ বাড়িতে।

দীপক স্ত্রীর দিকে আড়চোখে তাকায়। অসহিষ্ণুতার শেষ সীমায় পৌঁছেছে সে। গত তিনদিনের প্রস্তুতির কি পরিণতি ! প্রায় প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই অবুঝের মত করে কাজল, এমনকি আজকের মতন একটা জরুরী ব্যাপারেও যার উপর ওর চাকরীর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে। আন্তর্জাতিক রোবট ও যান্ত্রিক-মানব সংস্থা দীপককে রাজধানী পাঠাচ্ছে ট. ন. ই.-৩ মডেলের আইনগত কয়েকটা ছাড়পত্র আনতে আর সেই সময়ের জন্য কোম্পানি চায় তাদের নূতন গৃহস্থ মডেল ট. ন. ই.-৩ এর একটা শেষ হাতেনাতে পরীক্ষা, তাদেরই বাড়িতে।

কাজল, এখন আর না বলা যায় না। একটা প্রমোশন হতে পারে এর উপরেই। তাছাড়া তুমি তো জান ওটাতে ভয়ের কিছুই নেই। আপত্তিটা কোথায় ?

কাজল অসহায় ভাবে ভুরু কোঁচকায়।—কেমন যেন ভয় করছে। ঠিক বোঝাতে পারছি না।

কেন, ওটা তো আমাদের মতনই, প্রায়। তাছাড়া তোমার কাজেরও কত সুবিধা হবে। নাও চল এখন।

বাইরের ঘরে এসে দরজা খোলে দীপক। হাত বাড়ান ডঃ শান্তা কর। পেছনে ভাবলেশহীন মুখে টোনি, দৃষ্টি তার ভবিষ্যৎ তিন সপ্তাহের গৃহকর্ত্রীর দিকে।

আসুন। কোনরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় কাজলের। দীপক সামাল দিতে চায় অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে,—কাজল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি, আমার স্ত্রী কাজল বসু, আর এ হচ্ছে টোনি, ভারি কাজের ছেলে। দীপক টোনির কাঁধে একটা চাপড় মারে, কিন্তু টোনি অচঞ্চল।

সুপ্রভাত, মিসেস্ বসু। আপনার কুশল তো ?

টোনির গলা শুনে চমকে ওঠে কাজল। গম্ভীর অথচ সুরেলা গলা, মাথার চুল গায়ের চামড়ার মতনই মসৃণ। নিজেকে থামাতে গিয়েও কাজল বলে ফেলে,—আরে, তুমি কথাও বল ?

হ্যাঁ, বলি বৈকি।

কাজল শুধু বোকার মত একটু হাসি ফোটাতে পারে। টোনি কেমন হতে পারে না পারে সে ধারণা ওর মোটেই পরিষ্কার ছিল না। টোনির চুলগুলো পাট-পাট করে বসানো, কালো প্লাস্টিকের মতন না, সত্যিই আলাদা আলাদা রোঁয়া দিয়ে তৈরী ? সোনালী চাঁপা রঙের হাত আর মুখের উজ্জ্বল চামড়া জামা কাপড়ের মধ্যেও রয়েছে কিনা কে জানে ! কাজলের ভাবনা বাধা পায় ডঃ করের আবেগহীন গলার শব্দে।

মিসেস্ বসু, আমাদের এই পরীক্ষার গুরুত্ব আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। মিস্টার বসু নিশ্চয়ই কিছু কিছু বলেছেন, আমি বাদবাকিটা বলছি রোবট কোম্পানির সিনিয়র রোবট মনোবিজ্ঞানী হিসাবে। টোনি আসলে একটা রোবট, আমাদের ভাষায় ট. ন. ই-৩ তবে ওকে টোনি বললেই সাড়া দেবে। ও কিন্তু কেবল একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অথবা অঙ্ক গণক নয়, আমরা ওকে একটা কৃত্রিম মস্তিষ্ক দিয়েছি, যেটা প্রায় আপনার আমার মাথার মতই জটিল। ওর মাথাটা বানিয়েছি এমন ভাবে যে ও বাংলা বোঝে ও বলে, অন্য ভাষা শিখাবার ক্ষমতা ওর আছে। তাছাড়া ঘরের সমস্ত কাজ করবার জন্য সাধারণ ভাবে যা যা দরকার তার সবই কমবেশী শেখানো আছে টোনিকে। আমাদের কোম্পানি এতদিন শুধু কল-কারখানায় অতি খারাপ অবস্থায় অথবা বিপজ্জনক কাজ করবার উপযুক্ত কারিগর রোবট বানিয়েছে, এখন আমরা ঘরের কাজ করবার জন্য গৃহস্থ

রোবট বানাতে চাই। বাড়ির লোকেরা নির্ভয়ে ওদের মেনে নিতে পারলে তবেই সেটা ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল হবে। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে ভয় পাবার কোন কারণ নেই।
সত্যিই ভয়ের কিছু নেই। বলে ওঠে দীপক, টোনি কোন অন্যায় কাজ করতেই পারে না, না হলে ওকে এখানে রেখে আমি নিশ্চয় বাইরে যাওয়া ঠিক করতাম না।
যদি কোন কারণে চটে যায় ও আমার উপর···। ফিসফিস করে বলে কাজল।
গলা নামাবার কিছু নেই, ধীরে বলেন ডঃ কর।—ও আপনার উপর রাগ করতেই পারে না, ওকে বানানোই হয়েছে সেভাবে। ওর মাথার মধ্যে যে জটিল খুঁটি-নাটি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রোবটবিদ্যায় আমরা যাকে প্রথম নিয়ম বলি, সেটা হল, রোবট কোন মানুষকে আঘাত করবে না অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে কোন মানুষের ক্ষতি হতে দেবে না। প্রত্যেক রোবটকে এই নির্দেশ মেনে চলতে হয়। আমরা টোনিকে আপনার কাছে রাখতে চাই ও অন্যান্য কাজ কেমন করে, আর তাতে আপনার কতটা সুবিধা-অসুবিধা, আপনার কি প্রতিক্রিয়া, সেটাই দেখতে। এর মধ্যে মিস্টার বসু গৃহস্থ রোবট ব্যবহারের আইনগত অনুমতি আনতে যাচ্ছেন।
তার মানে এসব করছেন বে-আইনী ভাবে ?
না, তা ঠিক নয়, দীপক গলা পরিষ্কার করে,—অনুমতি আমরা পাবই। কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থেকো, কেউ যেন টোনিকে না দেখে ফেলে। ওকে বাইরে পাঠিও না কোন কাজে। কোম্পানি চায় যে চেনা শোনার মধ্যেই কেউ, অথচ যার গৃহস্থ রোবট সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, টোনিকে কয়েকদিন ব্যবহার করুক।
তবে তো···করুণ গলায় বলে কাজল।—আচ্ছা ও কি করে, মানে করতে পারে ?
বাড়ির যে কোন কাজ। ছোট করে উত্তর দিয়ে উঠে দাঁড়ান ডঃ কর, যাবার জন্য।
দীপক গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে যায় বিদায় জানানোর জন্য। কাজল পাশের আয়নায় নিজের ক্লান্ত মুখ আর জট পাকানো লম্বা চুলের দিকে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ খেয়াল হয় টোনি তাকিয়ে আছে তারই দিকে। হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে খেয়াল হয় কাজলের···ওটা একটা যন্ত্রমাত্র !
বিমানবন্দরের পথে, কলোনির মোড়ে, দূর থেকে একঝলক আভাস মেলে। মালবিকা রায়, ভাবতেই বুকের কাছে দুরুদুরু করে ওঠে দীপকের। এদের শুধু দীপকের দূর থেকেই পাওয়া যায়। ভগবানের নিখুঁত সৃষ্টি, তার উপর জানেন কি করে সাজতে হয়। যদি কাজল ওরকম হত। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে দীপকের। ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়া লাগায়, সময় বেশী নেই। ভেবে আর কি হবে !

দরজার মৃদু টোকার শব্দে ঘুম ভাঙে কাজলের পরদিন সকালে। হতবাক লাগে প্রথমে, পরমুহূর্তে হিম হয়ে যায় ভয়ে। গত সন্ধ্যাটা কোন রকমে টোনিকে এড়িয়ে, অথবা মুখোমুখি হলে একটু হেসে কাটানো গেছে, কিন্তু আজ? পুরো আরেকটা দিন।



কে কে ওখানে? টোনি?

হ্যাঁ মিসেস্ বসু। আসতে পারি?

কাজলের মুখ দিয়ে নিশ্চয়ই ইতিবাচক কোন আওয়াজ বেরিয়েছিলো, কারণ পরমুহূর্তেই নিঃশব্দে টোনি ঘরে ঢোকে। কাজলের নজর আর নাক দুটোই একসাথে জানান দেয় যে টোনির প্রসারিত হাতে ট্রের উপর প্রাতঃরাশ।

সকালের জলখাবার?

হ্যাঁ।

এত সকালে বিছানায় বসে প্রাতঃরাশ করাটা যে অভ্যাস নয় সেটা জানাতে সাহস পেল না কাজল। আধা বসা অবস্থায় হাত বাড়িয়ে ট্রেটা নেয় কাজল। মাখন টোস্ট, ডিমের ওমলেট আর কফি।

কফির চিনি আর দুধ আলাদা এনেছি। আপনার পছন্দগুলো তাড়াতাড়ি শিখে নেবো, আশা করি।

কাজল চুপ করে থাকে। অল্পক্ষণ পুতুলের মত খাড়া থেকে টোনি জিজ্ঞেস করে,—আপনি বোধহয় একা খেতে পছন্দ করেন?

হ্যাঁ। অবশ্য যদি আপনি, মানে তুমি কিছু মনে না কর।

ঠিক আছে। এরপর সাজগোজের জন্য দরকার হলে আমায় ডাকবেন।

না, না। কাজলের হাত কেঁপে যায়। কোনরকমে উল্টানোর হাত থেকে কাপটাকে বাঁচিয়ে দেখে, টোনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কখন। কাজল কোনরকমে খাওয়া শেষ করে। ওটাতো যন্ত্রই তবে আরেকটু যন্ত্র যন্ত্র দেখতে হলেই বোধহয় ভালো ছিল, অথবা যদি আরেকটু মানুষের মতন স্বাভাবিক ভাব ভঙ্গি হ'ত। এ যেন কেমন ভাবলেশহীন। ওর কালো চোখের বা সোনালী চামড়ার অন্তরালে কি আছে কে জানে। কাজলের হঠাৎ খেয়াল হয় ও কফিতে দুধ আর চিনি মেশাতে ভুলে গেছে, অথচ কালো কফি ও কোনদিনও পছন্দ করে না। কাপড় পাল্টে কাজল সোজা হাজির হয় রান্নাঘরে, এখানেই দিনের বেশীক্ষণ

কাটে। রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই পছন্দ করে ও। কিন্তু ঘরে ঢুকেই অবাক হতে হয়। এ যেন অন্য কারো রান্নাঘর, সবেমাত্র সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করা হয়েছে, হাত পড়েনি এখনো। থমকে দাঁড়ায় কাজল। এদিক-ওদিক দেখে পেছন ফিরতেই প্রায় ধাক্কা লাগে টোনির সাথে।

কি করতে পারি বলুন। টোনি বলে।

দেখ, একটু শব্দ করে হাঁটা চলা করবে। প্রায় রাগত স্বরে বলে কাজল।—সকালে এঘরে খাবার বানাওনি ?

হ্যাঁ, রান্নাঘরেই তো বানিয়েছি।

দেখে তো মনে হচ্ছে না সেরকম।

পরে পরিষ্কার করে রেখেছি। সেটাইতো করা উচিত, তাই নয় ?

কাজলের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। একথার আর উত্তর কি দেবে। তাকের উপর ঝক ঝক করছে কাপ, প্লেট, বাসন-কোসন।—খুব ভালো হয়েছে, সত্যিই তুমি কাজের লোক।

প্রশংসা টোনিকে স্পর্শ করে না। ধীর গলায় বলে,—ধন্যবাদ। আপনি একবার বসবার ঘরে আসবেন ?

কাজল পায়ে পায়ে বসবার ঘরে ঢোকে আর আবার অবাক হয়।

তুমি কি টেবিল, সোফা আর আসবাবপত্রে পালিশ লাগিয়েছ ?

ভালো হয়েছে তো ?

কখন করলে এসব ? কাল অবধি তো দেখিনি।

কাল রাতে করেছি।

তার মানে সারা রাত আলো পুড়িয়েছ ?

না। আমার মধ্যে একটা অতি বেগুনি রশ্মির বন্দোবস্ত আছে, রাতে তাতেই দেখতে পাই। আর আমার ঘুমের কোনই দরকার নেই, সেটা নিশ্চয়ই জানেন। প্রশংসার বদলে কাজলের মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে, তোমাদের জন্য তো কাজের লোকের আর দরকারই থাকবে না দেখছি।

না তা নয়। একঘেয়ে কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে বরং তাঁরা আরো দরকারী কাজ করতে পারবেন। আমরা কেবল শেখানো কাজই করতে পারি, কিন্তু আপনাদের মস্তিষ্কের সৃজনশীলতা ও বহুমুখিতা আমরা কোথায় পাবো ? বলতে বলতে শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে টোনির গলা।

আমার আবার মস্তিষ্ক। চাও তো তোমাকে দিতে পারি।

আপনার দুঃখটা কি যে এরকম একটা কথা বললেন ? আমি কি কিছু করতে পারি এ ব্যাপারে ?

কাজলের হাসি পায়। হাসির কথা বৈকি। একটা মনুষ্যরূপধারী যন্ত্র বৈ তো নয়, যার কাজ কাপ প্লেট ধোওয়া, ঘর ঝাড়া মোছা, রান্না করা বা ঘরের আর

যত খুঁটিনাটি কাজ। কারখানায় সদ্য তৈরী হয়ে এসে এখন সান্ত্বনা দিচ্ছে বা বিশ্বাস যোগাবার চেষ্টা করছে! কিন্তু হঠাৎ কাতরে ওঠে কাজল,—মিস্টার বসু মনে করেন না আমার কোন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, আর আমিও অবশ্য তাই-ই মনে করি। কান্নাটাকে চেপে থামাতে হয় কাজলকে। তৈরি করা একটা জিনিসের সামনে তার সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রতিভূ হিসাবে সম্মান বজায় রাখার একটা দায় অনুভব করে।

অবশ্য এটা সাম্প্রতিক ঘটনা। যোগ করে কাজল তাড়াতাড়ি,—তখনকার দিন আর এখন তো আর এক নয়। ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে দীপ, অথচ আমার থেকে যে সাহায্য পেলে ওর আরো উন্নতি হতে পারে, তা পাচ্ছে না। বড়-লোকের স্ত্রী হবার উপযুক্ত আমি নই। ও চায় আমি সুন্দর সাজি, ঘরদোর সাজাই, মাঝে মাঝে পার্টিতে আদর্শ গৃহকত্রীর অভিনয় করি। ও চায় আমি, আমি যেন মালবিকার মত হই। কাজলের গলা বুজে আসে, ভেজা চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে। টোনি কিন্তু ওর দিকে চেয়ে ছিল না। ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে—আমি আপনার ঘর সাজাতে সাহায্য করতে পারি!

ও হবার নয়। আমি বড় জোর আরামদায়ক করতে পারি ঘরকে, কিন্তু আজ-কালকার ফ্যাশন পত্রিকায় বাড়ি ঘরের যে রকম সব ছবি ছাপায়, সেরকম করবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

আপনি কি সেরকম কিছু চান?

শুধু চেয়ে কি লাভ?

আমি সাহায্য করব। এবার টোনি কাজলের চোখে চোখে চায়।

তুমি গৃহ-সজ্জার কিছু জানো?

ভালো গৃহস্থ হতে হলে কি ও সম্বন্ধে জানা উচিত?

নিশ্চয়ই।

তবে ও বিদ্যা শেখার ক্ষমতা আমার আছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটা বই আমাকে এনে দিতে পারেন?



এর পরে ঘটনা ঘটতে শুরু করে দ্রুত গতিতে।

বিকেলে কাছের গ্রন্থাগার থেকে দুটো মোটা বই এনে হাজির করে কাজল। টোনি একটা বই টেনে নিয়ে একের পর এক পাতা ওলটাতে শুরু করে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কাজল। তৈরি করা হাত এত সূক্ষ্ম কাজ কি করে করে!

আশ্চর্য হয়ে ও টোনির একটা হাত টেনে নেয় নিজের হাতে। টোনি নির্বিকার।
অদ্ভুত, তোমার নখগুলোও আসল মনে হয়।
সেটা অবশ্য ইচ্ছা করেই করা হয়েছে। বইতে নজর রেখেই জবাব দেয় টোনি, আসলে আমার চামড়াটা এক ধরনের প্লাস্টিক, আর ভিতরের কাঠামোটা তৈরী হয়েছে একটা হাল্কা অথচ শক্ত শঙ্কর-ধাতু দিয়ে। মজার মনে হচ্ছে?
না, না। লজ্জা পায় কাজল। তোমার সম্বন্ধে আমার এরকম কৌতূহল ভালো নয়। আমার সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন কেউ করলে আমি নিশ্চয়ই রাগ করতাম।
ওরকম কৌতূহল জাগার মত চিন্তা-পথ আমাদের মাথাতে রাখা হয়নি। যেমন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার বাইরে যাবার উপায় আমাদের নেই।
সজাগ হয়ে নিজেকে দোষারোপ করে কাজল। বার বার কেন ভুলে যাচ্ছে যে ও একটা যন্ত্রমাত্র। সহানুভূতি কি এতই দরকারী হয়ে পড়েছে যে টোনিকে নিজের সমান করে ভাবতে হবে। শুধুমাত্র এইজন্য যে ও কাজলের প্রতি সহানুভূতি দেখায় একান্ত আপনজনের মত!
বেশ কিছুক্ষণ পরে কাজল লক্ষ্য করে টোনি তখনও বইটার পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে একই ভাবে। কাজল এক ধরনের উন্নাসিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
তুমি বোধ হয় পড়তে জানো না, তাই না?
আমি পড়ছি মিসেস বসু। ধীর গলায় উত্তর।
কিন্তু—
আমি আসলে প্রত্যেকটা পাতার ছবি নিয়ে পাঠাচ্ছি আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে। ওটাই আমার পড়ার ধরন।
কাজল যখন শুতে গেল, প্রথম বই শেষ হয়ে দ্বিতীয়টা শুরু করেছে। অন্ধকারে বসেই পাতা উল্টাচ্ছে টোনি। আধো ঘুমে কাজলের ভাবনায় ভাসতে থাকে টোনির হাতের স্পর্শ। কোমল ও উষ্ণ, একদম মানুষের হাতের মতন। বিজ্ঞানের কি দারুণ উন্নতি হচ্ছে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে কাজল।
পরপর বেশ কয়েকদিন কাটল বাড়ি আর গ্রন্থাগার করে। টোনিই বলে দিতে লাগলো বইয়ের বিষয়বস্তু আর সম্ভাব্য নামগুলো। হরেকরকম বিষয়ঃ রঙ সমন্বয়, অঙ্গসজ্জা, অঙ্কন অথবা বেশভূষার ইতিহাস, সঙ্গে আছে অভিধান, শব্দকোষ ইত্যাদি। একই সাথে ভাষাও শিখে নিচ্ছে টোনি। বই আসে আর পাতা উল্টানো চলে। একবার পড়া হ'ল তো হ'লই, ভুলে যাওয়াটা কিন্তু টোনির ক্ষমতার বাইরে!
সপ্তাহ শেষ হবার আগেই টোনি কাজলকে উপদেশ দেয় কি ভাবে ওর চুল কাটা উচিত, ভুরুর কতটা কামাতে হবে আর তার পাউডার ও লিপস্টিকের রঙ কেমন হবে।
কম্পিত বক্ষে প্রায় আধঘণ্টা টোনির কোমল করের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে

আয়নায় মুখ তোলে কাজল।
আরো অনেক কিছু করবার আছে, বিশেষ ক'রে তোমার জামা কাপড়ে। বলে টোনি—আপাততঃ কেমন দেখাচ্ছে বল ?
কাজলের উত্তর দিতে দেরী হয় অনেকটা। আয়নাতে উদ্ভাসিত সুন্দর মুখটার সাথে পরিচিত হতে যতক্ষণ লাগে অন্ততঃ ততক্ষণ তো বটেই। ধরা গলায় বলে,—আপাততঃ ভালোই, টোনি।



দীপকের কাছে চিঠিতে এসব কিছুই উল্লেখ করে না কাজল। দীপ নিজে এসেই দেখুক। ভেতরে ভেতরে আবিষ্কার করে যে শুধু দীপকের অবাক হয়ে যাওয়াটাই নয়, একটা প্রতিশোধের আনন্দও পাওনা হয়েছে।
একদিন সকালে টোনি পাড়ল কথাটা।—এবার কিছু কেনাকাটা করা দরকার। আমার বাইরে যাওয়া মানা। লিখে দিলে ঠিক ঠিক জিনিস নিয়ে আসতে পারবে তো তুমি ? সোফার কাপড়, কার্পেট, দেয়ালের নক্সা করা কাগজ, রঙ, শাড়ি, ব্লাউসের কাপড়, আরো ছোট খাট কয়েকটা জিনিস লাগবে।
যা চাচ্ছো তাই পাবে, এর কোন মানে নেই।
একটু ভালো করে খুঁজলে আর টাকা ফেললে পছন্দের কাছাকাছি জিনিস পাওয়া যাবেই।
টাকাটা একটা বড় সমস্য বইকি।
মোটেই নয়। প্রথমে যাও আন্তর্জাতিক রোবট কোম্পানিতে। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ডঃ করকে বলবে যে আমি বলেছি, খরচটা ওদের পরীক্ষার অঙ্গ।
রোবট কোম্পানি থেকে বেরিয়ে কাজল সোজা চলে আসে শহরের সবচেয়ে নামকরা বিভাগীয় বিপণিতে। এর সামনে দিয়ে অনেকদিনই ওরা যাতায়াত করেছে, কিন্তু এখানে ঢোকার দুঃসাহস হয়নি কোনদিনও। আজ সাথে অনেকগুলো টাকা থাকায় অনেকটা আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া লাগে কাজলের। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কেতাদুরস্ত বিক্রয়িকা একজন যখন এগিয়ে আসে, কাজলের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোতে চায় না। অতি কষ্টেও প্রয়োজন বোঝাতে না পেরে বাড়িতে ফোনে ধরে টোনিকে।

যদি কিছু মনে না করেন, দৃঢ় গলায় বলবার চেষ্টা করে কাজল,—আপনি আমার, ইয়ে, সচিবের সাথে কথা বলুন একটু।
ভদ্রমহিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফোন ধরেন, কিন্তু ছাড়লেন বিনয়ে গদগদ হয়ে।
আপনি দয়া করে আমার সাথে আসুন, আমি আপনার প্রয়োজনমত জিনিস দেবার চেষ্টা করব।
একমিনিট। কাজল দ্বিতীয়বার ফোনে টোনির সাথে কথা বলে, তুমি কি বললে জানিনা টোনি, তবে বুঝেছেন বলেই মনে হল। সত্যি তুমি, তুমি একটা··· খুউব ভালো।
ফোন নামিয়ে পিছন ফিরতেই দেখা হয় মালবিকা রায়ের সঙ্গে। তার দিকেই চেয়ে আছেন।
কে, মিসেস বাসু ?
আত্মবিশ্বাস ধুলায় লোটায়। বোকার মত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না কাজল।
জানতাম না আপনি এখানে বাজার করেন। কাজল যেখানে বাজার করে সেখানে মালবিকা রায়ের আসাটা যেন যথেষ্ট অসম্মানের।
সাধারণতঃ আমি এখানে আসি না। ছোট হয়েই বলে কাজল।
আপনার চুলের বাহার পাল্টেছেন মনে হচ্ছে। বেশ···মানে একটু নূতন ধরনের। আচ্ছা চলি। হ্যাঁ, আপনার স্বামীর নামই তো দীপক ? তাই না ?
রাগে দাঁতে দাঁত লাগে, কিন্তু সাফাই গাইতেই হয়।—হ্যাঁ। টোনি আমার স্বামীর বন্ধু। আসলে ওর হয়েই কিছু কেনাকাটা করছি এখানে।
দেখতেই পাচ্ছি। বেশ বড়লোক বন্ধু, আর খুউব ভালো লোক বোধহয়। হাসিতে বিষ ছড়িয়ে অন্যদিকে পা চালান মালবিকা রায়।
টোনির কাছে ক্ষোভ বা অসহায়তা প্রকাশ করতে কাজলের আর বাধে না। দশদিনের পরিচয়ে ওর কাছে কাঁদতেও পারে আজ।
আমি, আমি একটা গর্দভ বনে গেছি। রুমালে চোখ মোছে কাজল, উনি গায়ে পড়ে অপমান করেন আমাকে। কেন জানি না, তবুও ঐরকমই। ইচ্ছা করছিল চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে ফেলে পায়ের তলায় পিষি।
তোমরা একে অপরকে এতটা ঘৃণা করতে পারো এটা আমার জানা ছিল না। টোনি অবাক হয়।
উঁহু, ওনাকে নয়। কাতরে ওঠে কাজল। নিজেকেই আমি ঘৃণা করি। বরং ওনার মতন হতে চাই আমি, অন্ততঃ বাইরের চালচলনে, কিন্তু কিছুতেই পারি না।
টোনির গলা নীচু খাদে কিন্তু দৃঢ়,—নিশ্চয়ই হতে পারো। আমাদের হাতে আরো দশদিন আছে। দশদিনে আমরা সবকিছু বদলে দিতে পারি। সেই

ছকই তো আমরা আঁকছিলাম এ কদিন।
কিন্তু তাতেই বা লাভ কি হবে? উনি জানবেন কেমন করে?
ওনাকে এখানে নিমন্ত্রণ কর। ওনাকে আর ওনার বন্ধুবান্ধবদের। শোনো, আমি বলি ওদের ডাকো আমার যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা।
উনি আসবেন না।
নিশ্চয়ই আসবেন। উনি আসলে আসবেন হাসতে এবং হাসতে উনি পারবেন না। টোনির চোখে কি হঠাৎ ভাবান্তর খেলে গেল!
টোনি, সত্যিই কি ওরকম হবে, আমরা পারবো? টোনির দুহাত টেনে নেয় নিজের হাতে কাজল। তারপর আস্তে আস্তে বলে,—কিন্তু কি লাভ? আমি তো করছি না, তুমিই সব করবে।
কেউ-ই একা কিছু করে না। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে টোনি,—এটা আমার জানা আছে। মালবিকা রায়কেই ধর। উনি টাকার গরম আর সামাজিক পরিচিতির জোরেই বুক ফুলিয়ে বেড়ান। কই, তাঁর কোন সংকোচ হয় না তো। তবে তোমার অসুবিধাটা কি? আমাকে তৈরিই করা হয়েছে হুকুম মানার জন্য, তবে তার কতটা আগ বাড়িয়ে করব বা না করব, সেটা আমার ব্যাপার। তোমার ক্ষেত্রে আমার কোন দ্বিধা নেই, কারণ মানুষ বলতে আমাকে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তুমি তাই। দয়ালু, বন্ধুভাবাপন্ন, সাদাসিধে আর সত্যবাদী। মিসেস রায়, তোমার বর্ণনা মতন, ওরকম মোটেই নন। তোমার কথা আমি যত সহজে শুনব, ওনারটা তত স্বেচ্ছায় নয়। তুমি কেন ভাবছ আমি করছি, আসলে তুমিই করছ আমি তোমায় সাহায্য করছি মাত্র।



টোনি আস্তে হাত দুটো সরিয়ে নেয়। কাজল টোনির ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভীত হয়ে ওঠে, না জানা কি এক ভয়ে। ঢোক গেলে কাজল, আর কাঁপতে থাকা আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকায়। হাত ছাড়বার ঠিক আগে টোনি কি তার আঙ্গুলগুলোকে অতি যত্নে আদর করার মতন চেপে ধরেছিলো! নিশ্চয়ই তাই, কাজল নিঃসন্দেহ। কাজল ছুটে যায় কলের তলায় হাতধুতে, অকারণে।
পরের দিন কাজলের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছিল, কিন্তু টোনির কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। ও কাজ করে চলেছে। সোফার কভার কাটা, সেলাই করা, দেয়ালে রঙিন নক্সা করা কাগজ লাগানো, ঘরের দরজা জানলার পর্দা ···

হরেক কাজ। ওর হাত চলে নির্ভুল পারদর্শিতায়, আঙ্গুলগুলো চলে সূক্ষ্মভাবে কিন্তু অনায়াস দৃঢ়তায়।

রাত জেগে কাজ করে টোনি, নিঃশব্দে। সকালে উঠে নিত্য নূতন চমক লাগে কাজলের। এর মধ্যে একদিন মাত্র ও টোনির কাজে সাহায্য করতে গিয়েছিল। টোনির জ্যামিতিক দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট জায়গায় একটা ছবি টাঙ্গানোর চেষ্টা করছিল কাজল। একটু বেশি তাড়াহুড়া করছিল কাজল, আর মইটাও ছিল নড়বড়ে। পড়বার আগে চিৎকার করে ওঠে কাজল। পাশের ঘর থেকে অমানুষিক ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে এসে টোনি মেঝের চার-পাঁচ ইঞ্চি উপর থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় কাজলকে। অচঞ্চল গভীর চোখে কোন ভাষা নেই শুধু দরদী গলা শোনা যায়, তোমার লাগেনি ত কাজল?

এই প্রথম লক্ষ্য করে কাজল, টোনির চুল তার হাত লেগে এলোমেলো, আলাদা আলাদা রোঁয়া দিয়ে তৈরি। পরমুহূর্তেই টের পায় টোনির দুই হাত তার শরীর ঘিরে, ঘাড়ের কাছে একটা আরেকটা হাঁটুর নীচে। চেঁচিয়ে উঠে ধড়মড় করে মাটিতে পা রাখে কাজল। নিজের চিৎকার নিজের কানেই লাগে। সারাটা দিন সে নিজের ঘরে বসে কাটায়। রাত্রিতে শুতে যাবার আগে ভারী আরাম কেদারাটা ঠেলে দেয় বন্ধ দরজার মুখে।

নিমন্ত্রণপত্রগুলো পাবার সাথে সাথেই সবাই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে উত্তর পাঠায়। ঠিক যেমনটি টোনি বলেছিলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হব হব। শেষবারের মত আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় কাজল। কয়েকদিন আগেও এ সাজ করবার কথা ভাবতে পারেনি। গালের রঙ, ভুরু, চুলের খোঁপা সবই অন্যরকম। ঘরের সাজগোজ একদম অচেনা। ভিতরে ভিতরে সাহস অনেক বেড়ে গেছে কাজলের। সুন্দর হাসির সঙ্গে উদ্ধত দৃষ্টির একটা মিলনের চেষ্টা করতে থাকে বারে বারে। দীপক কিভাবে নেবে।…কিছু যায় আসে না। ও এলেই আবার আরম্ভ হবে অবহেলা আর উপেক্ষার দিন। কাল সকালেই টোনি চলে যাচ্ছে, ভাবতেই বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। তার সাথেই চলে যাবে জীবনের সব থেকে রোমাঞ্চকর কয়েকটা দিন!

বাইরের ঘরে ঘড়িতে সাতটা বাজলো।

টোনি, সবাই এখনি এসে পড়বেন, তুমি বরং ভিতরের ঘরটায় লুকাও। ওরা তোমায়…। কাজলকে থামতে হয়। কোথায় টোনি? টোনি। গলা অল্প তোলে কাজল।

টোনি-ই। চেঁচিয়ে ওঠে কাজল, কিন্তু টোনির হাত দুটো ওকে জড়িয়ে ধরেছে। মুখের কাছে ওর মুখ, শরীরে আলিঙ্গনের চাপ। জড়ানো গলায় বলে টোনি, —কাজল, আজকের ঘটনার মতন অনেক কিছুই আমার বোঝবার নয়। কালকে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে তোমাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়াও

আমার আরো কি যেন দেবার ছিল। এটা খুবই অস্বাভাবিক আমার কাছে, তাই নয় ?

মুখের আরো কাছে মুখ আসে, কিন্তু সেখানে শ্বাস-প্রশ্বাসের আভাস মেলে না। দরজার ঘণ্টি বেজে ওঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেহের টাল সামলায় কাজল। টোনি নিরুদ্দেশ, ধারে কাছে নেই। দরজায় আবার কর্কশ শব্দ, বাজতেই থাকে মুহুর্মুহু।

বাইরের জানলার পর্দাগুলো ওঠানো। পনের মিনিট আগেও কাজল নামানো দেখেছে। তার মানে ওরা দেখেছে, ওদের সবাই, সবকিছু! অতি বিনয়ের সঙ্গে ঘরে ঢোকে সবাই। নিশ্চয়ই দেখেছে সব নইলে এত চুপচাপ কেন সবাই। মালবিকা প্রায় বিড়বিড় করে জানতে চায় দীপক কোথায়।

হ্যাঁ, দীপ অফিসের কাজে বাইরে গেছে, কাল ফিরবার কথা। না না, মোটেই একলা লাগেনি। দারুণ কাটল এ কটা দিন। হাসতে হাসতে কাজল উত্তর দিতে থাকে। একদম আর ভয় করছে না। কারণটাই বা কি, কি বলবে ওরা। দীপককে আসল কথা তো জানাতে পারবে না, আর পারলেও বা কি এসে যায়। না ওরা কেউ-ই হাসতে পারেনি। মালবিকার চোখে হিংসার উষ্মা থাকলেও ঔদ্ধত্য ছিল না। কাজল একসময়ে শুনে ফেলে মালবিকার নীচু গলা···সুন্দর, এরকম সুপুরুষ আগে দেখিনি। কাজল বুঝতে পারে কোথায় ওরা আজ হেরে গেল। মালবিকার মতন সুন্দরী ও না হতে পারে, কিন্তু ওরা কেউ স্বপ্নেও আশা করে না এমন সুন্দর একজন প্রেমিক পাবার।



ওরা চলে যাবার পর কাজলের বার বার মনে হতে থাকে যে টোনি একটা রোবট, একটা যন্ত্র মাত্র, যন্ত্র!

পরদিন সকালে একটা গাড়ী এসে টোনিকে ফেরত নিয়ে যায়।

দীপক বসু টোকা মেরে ডঃ শান্তো করের ঘরে ঢোকে। ডঃ করের সঙ্গে তখন কোম্পানির গণিতবিদ ডঃ প্রণব লাহিড়ী বসে।

কাজল বলছিল, দীপক বলে,—আমাদের বাড়ির নূতন সবকিছুর খরচ কোম্পানির থেকে···

হ্যাঁ। ওটা আমাদের পরীক্ষার খরচ হিসাবেই আমরা ধরেছি। তোমার পদোন্নতির খবর পেয়েছি, আশা করি ওগুলো এখন আর বেমানান হবে না।

ধন্যবাদ। ছাড়পত্র পেলে হয়ত বছরখানেকের মধ্যে একটা ট. ন. ই.-৩ মডেলও

চিনতে পারব। তবে…

কিছু বলতে চাও ? জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকান ডঃ কর।

আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। এ কদিনে কি যেন একটা ঘটে গেছে বাড়িতে। এমনকি কাজল অবধি বদলে গেছে। বোকার মত হাসে দীপক।—ও যেন আর আমার সেই কাজল নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।

দীপক, আমাদের পরীক্ষায় তোমার স্ত্রী সত্যিই সুন্দর ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তোমার উন্নতির অনেকটাই ওনার প্রাপ্য। ডঃ কর মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। বলবার কিছু না পেয়ে বেরিয়ে আসে দীপক।

টোনির বিবৃতিটা পড়েছ ? ডঃ কর প্রশ্ন করেন।

পুরোটা, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে। উত্তর দেন ডঃ লাহিড়ী, তার সাথে যোগ করেন,—ট. ন. ই.-৩ মডেলের পরিবর্তন দরকার।

তাই নাকি। কারণটা কি শুনি ?

গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারে যে রোবট নিশ্চয়ই তাকে বাজারে ছাড়া যায় না।

হেসে ওঠেন ডঃ কর,—টোনির প্রেমে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওর মাথাতে ওসব চিন্তা আদপেই আসেনি। যন্ত্র প্রেম করতে পারে না। শেষ সন্ধ্যার যে বর্ণনা টোনি দিয়েছে তা সত্যি, আর তাকে প্রেমাভিনয়ও বলা যেতে পারে। রোবটীয় প্রথম সূত্র অনুসারে, মানসিক পীড়ন ও অবশ্যম্ভাবী ক্ষতির থেকে কাজলকে বাঁচানোর জন্যই ও অক্লান্ত খেটেছে, আর সার্থকও হয়েছে ওর খাটুনি। নিজের মুখে সে কথাইতো বলে গেল দীপক বসু। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে একমত যে টোনির পরিবর্তন দরকার। তবে কারণটা কি শুনবে ? ওকে বানানোর সময় আমরা এটা হিসাবের মধ্যেই আনিনি যে মেয়েরা সবকিছু জেনে এবং বুঝেও, টোনির প্রেমে পড়তে পারে।

[আইজাক অ্যাসিমোভের গল্প অবলম্বনে]

অনুবাদ ঃ **ডঃ সিদ্ধার্থ রায়**

ক্লিফোর্ড ডি সিমাক্

সিমাক্ এর জন্ম হয় আমেরিকার উইসকনসিন এ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি জার্ণালিজম নিয়ে উইকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করেন। সিমাক্ এর চাকুরী জীবন শুরু হয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই ওর লেখালেখির দিকে ঝোঁক ছিল। এবং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার প্রতি আগ্রহ ছিল বেশী।

সিমাক্ এর লেখা প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের নাম 'ওয়াল্ড' অফ দি সান'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ সালে। কিছুদিন লেখার পর তিনি ঠিক করেন আর বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা লিখবেন না। কিন্তু তার এক বন্ধু এ্যষ্টাউন্ডিং-এর সম্পাদক হওয়ার দরুন সিমাকের কল্পনা বিজ্ঞানের লেখা আবার নতুন করে শুরু হয়। রোবট নিয়ে তাঁর লেখা বিখ্যাত গল্প 'হাউ-হ' প্রথম প্রকাশিত হয় গ্যালেক্সিতে ১৯৫৪ সালে।

সিমাক তাঁর লেখার জন্য প্রথম হুগো পুরস্কার পান ১৯৫৯ সালে। নভেলেটের নাম দি বিগ ফ্রন্ট ইয়ার্ড। এরপর ১৯৬৪-তেও সিমাক হুগো পুরস্কার পান।

সিমাক এর লেখা অন্যান্য বই ঃ টাইম এণ্ড এগেইন (১৯৫১), টাইম ইজ দি সিপ্লেন্ট থিংগ (১৯৬১), ডেস্টিনি ডল (১৯৭১), কসমিক ইঞ্জিনিয়ার (১৯৫০), এম্পায়ার (১৯৫১),রিং এরাউন্ড দি সান ১৯৫৩), দি ট্রাবল উইথ টাইকো (১৯৬১), দে ওয়াকড লাইক মেন (১৯৬২), ওয়ে ষ্টেশন (১৯৬৬), হোয়াই কল দেম ব্যাক ফ্রম হেভেন (১৯৬৭), দি ওয়ারউলফ প্রিন্সিপল (১৯৬৭), দি গোবলিন রিয়ার-ভেকান (১৯৬৮),আউট অফ দেয়ার মাইনডস্ (১৯৭০), সিমেষ্ট্রি ওয়ার্ল্ড (১৯৭৩)।

ছোটগল্প সংকলন ঃ ষ্ট্রেনজার্স ইন দি ইউনিভার্স (১৯৫৬), দি ওয়ার্ল্ড অফ ক্লিফোর্ড সিমাক (১৯৬০), অল দি ট্র্যাপস্ অফ আর্ট (১৯৬২), ওয়ার্ল্ড'স উইথ আউট ফ্লেশ (১৯৬৪),বেষ্ট সাইন্স ফিকশন ষ্টোরিস অফ ক্লিফোর্ড সিমাক্ (১৯৬৭) এবং সো ব্রাইট দি ভিশন (১৯৬৮)। এ ছাড়াও সিমাক্ সম্পাদিত নেবুলা পুরস্কার পাওয়া (ষষ্ঠ) গল্পগুলির এক সংকলন প্রকাশিত হয়। ইউ এস থেকে এই সংকলনের প্রকাশ কাল ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ।



ওরিওয়ার্ট

চার্লি পেটো্র ডেইলি টাইমস কাগজের একজন কপিরিডার। অর্থাৎ কপিরিডার একটি অদ্ভুত চরিত্র। তাদের কথা, সেমিকোলনের পরীক্ষক বলা যেতে পারে। সারাদিন ধরে হাজার হাজার দরকারী অদরকারী খবর ঘেঁটে বেছে সাজানই তাদের কাজ। আমরা প্রতিদিন যত খবর পড়ি তার চেয়ে অনেক বেশী খবর পড়ে বা জানে একজন কপিরিডার। একজন কপিরিডার মানে এক একটি চলমান জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।

নানা ঘটনাচক্রে একজন রিপোর্টার কিংবা সম্পাদকের সঙ্গে আপনাদের দেখা হোতে পারে। কখনও কখনও তাদের নাম শুনতে কিংবা ছবি দেখতে পারেন, কিন্তু কখনই একজন বেচারা কপিরিডারের কথা কেউ শুনবেন না।

চার্লি পোর্টার তার সহকর্মী অন্যান্য কপিরিডাদের সঙ্গে একটা ইউ আকৃতির টেবিলে বসে। সেই কপিরিডার যদি দীর্ঘদীন ধরে এই একই কাজ করে যায় চার্লির মতন, তাহলে তার চোখে একটা সবুজ চশমা উঠবেই এবং তার সার্টের হাতা কনুই অবধি গোটান থাকবে।

ইউ আকৃতির টেবিলটার মাঝখানে বসেন বড়বাবু। এই ইউ টেবিলটাকে বলা হয় স্লট এবং বড়বাবু হোলেন স্লটম্যান। প্রতিদিনের যাবতীয় খবর প্রথমে এই স্লটম্যানের কাছে আসে। তিনি সেগুলোকে পাচার করেন কপিরিডারদের কাছে, এডিট করা এবং হেডলাইন দেবার জন্য।

যেহেতু এই খবরগুলো সর্বদাই এত বড় হয় এবং এত বেশি পরিমাণে আসে যে তার সব ছাপতে গেলে একটা কাগজের কলেবর কুড়িগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। বেচারা কপিরিডারদের কাজ এই কুড়িগুণ খবর ও গল্পকে কেটে ছেঁটে একগুনে নামিয়ে আনা এবং ক্রমান্বয়ে রিপোর্টারদের বিরাগভাজন হওয়া। তাদের অতি সযত্নে সংগৃহীত খবরটাকে কেটে ছেঁটে ছোট, এবং অবশ্যই সুখপাঠ্য করে, প্রকাশ হোতে দেখলে রিপোর্টারদের রাগ হবারই কথা।

বিকেলের দিকে কাজ যখন কিছুটা হাল্কা হয়ে আসে, তখন কপিরিডাররা তাদের সারাদিনের নিস্তব্ধতা ভেঙে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে। তারা খবরাখবরগুলো নিয়েই নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক জুড়ে দেয়। তাদের পরিচয় যদি কারুর না জানা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এই ধারণা করবেন যে কোনও আন্তর্জাতিক পরিষদ কোনও জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনায় ব্যস্ত।

কপিরিডারদের কাজের বিশেষত্বই তাদের সাদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রাখে। তারা প্রতিনিয়ত এমন সব টাটকা ও চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে যা মানবজাতির ভবিষ্যত এবং নিয়তির দিক নির্দেশ করে।

এই সব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কপিরিডারদের মধ্যে চার্লি যেন একটু বেশী মাত্রায় সন্ত্রস্ত। সে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে ভেবে মরে যার কোন মানেই হয় না।

চার্লির এত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ কতগুলো "অসম্ভব" ঘটনা পরপর ঘটে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল থাকা। দুতিনটে ঐ রকম ঘটনা ঘটার পর অন্যান্য কপিরিডাররাও নিজেদের মধ্যে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে, তবে নেহাতই কথা প্রসঙ্গে কোনও গুরুত্ব দেয়নি।

চার্লি কিন্তু ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে চিন্তিত হয়েছে মনে মনে, লুকিয়ে চুরিয়ে, যেহেতু তার সহযোগী কপিরিডার বা ঘটনা গুলোকে আদৌ প্রাধান্য দেবার উপযুক্ত বলে মনে করে নি, উড়িয়ে দিয়েছে। চার্লির মনে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে, কারণ সে ঐ সব ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছে। প্রথমতঃ সেই যাত্রীবাহী বিমানভেঙ্গেপড়ার ঘটনাটা। খারাপ আবহাওয়ার দরুন উদ্ধার কাজে একটু দেরী হলেও শেষ অবধি উদ্ধারকারী বিমানের পাইলটরা একটা পাহাড় চূড়ার অর্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ঐ বিমানের ছিন্নভিন্ন ভাঙাচোড়া অংশগুলো দেখতে পেয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বলেছিলেন যেভাবে বিমানটা আছড়ে পড়েছে তাতে ঐ বিমানের একটি প্রাণীরও জীবিত থাকার কথা নয়। তবুও উদ্ধারকারী দলের লোকেরা পাহাড়ের ওপরে ভাঙা বিমানটার কাছে যাচ্ছিল। পথে তাদের সঙ্গে ঐ দুর্ঘটনা কবলিত বিমানের যাত্রীদের দেখা হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই বহাল তবিয়তে ছিলেন এবং নিজেরাই

হেঁটে নীচে নেমে আসছিলেন।
তারপর আছে মিডনাইট নামে ঘোড়াটার ডার্বি জিতে যাবার ঘটনা। মিডলনাইটের জেতার সম্ভাবনা এতই কমছিল যে তার ওপরে ধরা বাজীর দাম ছিল একটাকায় চৌষট্টি টাকা।
তারপরেও আছে সেই অসুস্থ বাচ্চামেয়ের ব্যাপারটা যার বাঁচার এক ফোঁটাও আশা ছিল না। মেয়েটির বাবা মা তাই তার জন্মদিনের সাত দিন আগেই তার শেষ জন্মদিনের পার্টি দিয়েছিলেন। ছোট্ট মেয়েটির ছবি বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়েছিল, গল্পও। অসংখ্য পাঠক বাচ্চাটিকে নানা উপহার এবং শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন তার শেষ জন্মদিনটাকে আনন্দে ভরিয়ে দিতে এবং তারপরই হঠাৎ একদম আচমকা বাচ্চাটি সেরে উঠল। কোনও নতুন চমকপ্রদ ওষুধে নয়, কোনও বিশেষ ডাক্তারী চিকিৎসায় নয় একদম ঝট্ করে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে গেল এক রাত্রের কোনও এক সময়ে।
এর ঠিক কদিন পরেই ঘটে কেনটাকি অঞ্চলের 'বুড়ো পল' নামে কুকুরের ঘটনাটা। কুকুরটা একটা পাহাড়ের গুহায় ঘুরতে ঘুরতে ধ্বসে আটকে যায়। গাঁয়ের লোকেরা অনেক চেষ্টা করেছিল বেচারা বুড়োপলকে" বার করার। বেশ কদিন ধরে জোড় খোঁড়াখুড়ি চলে। তারা চিৎকার করে নানাদিক থেকে কুকুরটার নাম ধরে ডাকাডাকি করে। কুকুরটা কেঁদে কেঁদে তাদের ডাকে সাড়া দেয় তারপর একদিন থেমে যায়। লোকেরা পাথর সরানো খোঁড়াখুঁড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। উত্তেজিত ভাবে আলাপআলোচনা করে। নিজেদের অসহায় ভেবে দোষারোপ করে তারপর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে যে যার ক্ষেতে গিয়ে কাজে লেগে পড়ে।
ঠিক তার দুদিন পরে "বুড়োপল" ফিরে আসে। যদিও তখন তার চেহারা কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, তবুও সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এসে এক গামলা দুধের মধ্যে যেভাবে মুখ ডুবিয়ে দিল তাতে সকলেই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠেছিল। সবাই এই সিদ্ধান্তে আসে যে "বুড়োপল" কোনও ভাবে একটা বেরোবার রাস্তা বার করে ফিরে এসেছে।
যদিও দিনের পর দিন খাদ্য, বিশেষ করে জল পান না করে একটা গুহায় আটকে পড়া কুকুরের পক্ষে নিজে রাস্তা খুঁজে ফিরে আসা অসম্ভব।
একটা ছোট্ট দুর্বল অসুস্থ মৃতপ্রায় মেয়ের পক্ষে একটা রাত্তিরের মধ্যে বেমক্কা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠাও অসম্ভব। কিংবা একটাকায় চৌষট্টি টাকা দরে ধরা বাজিতে ডার্বি জেতা যায় না।
অথবা কোনও বিমানই একটা পাহাড় চূড়ায় এমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে না কাউকে বিন্দুমাত্র আহত না করে।
একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে, দুটোও অসম্ভব নয়। কিন্তু অল্প

কদিনের ব্যবধানে এতগুলো অদ্ভুত ঘটনা পরপর ঘটতে পারে না।

চার্লির বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল ঐ চারটে ঘটনার মধ্যে মিল খুঁজে পেতে। শেষ অবধি সে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র খুঁজেও পেয়েছিল যা তার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সেই ছোট মিলটা হোল এই যে, ঐ চারটে ঘটনাই ছিল খুব চাঞ্চল্যকর, তার রেস এবং তা নিয়ে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে।

যাত্রীবাহী বিমানটি ভেঙ্গে পড়ার পর বিশ্ববাসীকে দুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য। মিডনাইট নামের ঘোড়াটা যে রেসে দৌড়বে এবং তার জেতার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই একথা সবাই জানত। সেই মৃতপ্রায় বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে আহা, উহু চুকচুক কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। "বুড়োপল" নামের কুকুরটা এক সপ্তাহ বা তার বেশী গুহায় বন্দী ছিল, গ্রামের লোকেরা হাল ছেড়ে দেবার আগে।



প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ঘটনার প্রকৃত ফলাফল কারুরই সঠিক জানা ছিল না যতক্ষণ না ঘটনাটা নিজের থেকে ঘটে গেল। কোনও একটা ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত অনেকগুলো সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি মারে। কোনটা বেশী সম্ভব কোনটা কম, কিন্তু কোনটাই উড়িয়ে দেবার মত নয়। যে মুহূর্তে শূন্যে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া হয় হেড-টেল করার জন্য তখন থেকে পয়সাটা মাটিতে হেড বা টেল হয়ে না পড়া অবধি অনেকগুলো সম্ভাবনা থেকে যায়। পয়সা হেড বা টেল হয়ে না পড়ে খাড়া ভাবে পড়তে পারে এবং সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। যদিও সাধারণ ভাবে তা অসম্ভব।

এবং ঠিক এটাই ঘটেছে বার-বার। চার্লি নিজের মনেই বলল। একটা পয়সাকে চারবার শূন্যে ছোঁড়া হয়েছে হেড-টেল করার জন্য, চারবারই সেটা খাড়াভাবে পড়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

তবুও চারটে ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা যেন একটু অন্যরকম ঐ বিমান ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারটা।

অন্য তিনটে ঘটনার বেলায় পয়সাটা শূন্যে ছোঁড়া হয়েছে। লোকেরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেছে হেড হবে না টেল হবে জানতে এবং ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা কোনও দৈবউপায়ে ভাল হয়ে গেছে। মিডনাইট নামের ঘোড়াটা কোনও কারণে ভীষণ ভাল দৌড়ে বাজি জিতে নিয়েছে। "বুড়োপল" নামের কুকুরটা কোনও ভাবে গুহা থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু ঐ যাত্রীবাহী বিমান ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারটা—যে মুহূর্তে বিশ্ববাসী ঐ বিমান দুর্ঘটনার সম্বন্ধে জানতে পারল তার আগেই সেই পাহাড় চূড়ায় হেড বা টেল যা হবার হয়ে গেছে। প্রকৃত ঘটনা যা ঘটার তা ঘটে গেছে। ঐ বিমানের যাত্রীদের জন্য প্রর্থনা জানানো বৃথা জেনেও মানুষ প্রর্থনা করেছে।
ভগবান বেচারা কুকুরটাকে একটা বেড়িয়ে আসার রাস্তা দেখিয়ে দাও।
দয়া করে অসুস্থ্য বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দাও।
হে ভগবান! আমাকে জীবনে এই একবার ডার্বিতে জিতিয়ে দাও।
কিন্তু ভগবান ঐ ভাঙ্গা প্লেনের সব মৃত যাত্রীকে গতকাল থেকে বাঁচিয়ে দাও—?
যে কোনও কারণেই হোক ঐ বিমান ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাটা চার্লিকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে।
ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অভাবনীয় ভাবে ইরানের পরিস্থিতি একদম স্বভাবিক হয়ে গেল যখন সবাই আশংকা করেছিল সেখানেও কোরিয়ার মতন সংকটময় অবস্থা দেখা দেবে।
দিন পাঁচেক পরে ইংলন্ড গর্বভরে ঘোষণা করল বৃটেন তার যাবতীয় অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে ইংলন্ডের আর কোনও ঋণ নেবার প্রয়োজন হবে না।
এই দুটো ঘটনাকে একনাগাড়ে ঘটে যাওয়া ঐ চারটে অসম্ভব ঘটনার সঙ্গে এক-সুতোয় গাঁথতে চার্লির খুব বেশী সময় লাগেনি।
মনের মধ্যে ঐ ব্যাপারগুলোকে নিয়ে তোলপাড় করতে করতে একদম হঠাৎই মাস কয়েক আগের আর একটা ঘটনার কথা চার্লির মনে পড়ে গেল। একটা ছোট্ট খবর, ওদেরই কাগজে বের হয়েছিল, যদিও খবরের কাগজে ছাপা হবার মতন তেমন গুরুত্ব খবরটার ছিলনা। চার্লি ওর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ফাইলরুমের দিকে দৌড়ল। স্পোর্টসে নয় বাজার-সংক্রান্ত খবরেও নয় ওটা নিশ্চই অদ্ভূত বা আশচর্য গল্পের ফাইলে পাওয়া যাবে। দিনটা ঠিক ওর মনে নেই, বেশ কয়েক মাস আগের ঘটনা সেটা, তবু ওটা ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। চার্লি ফাইলগুলো হাতড়াতে থাকে।
সেদিনের ঘটনাটা ওর বেশ মনে আছে। শ্লটম্যান মিঃ জেনসেন প্রথমে খবরের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়লেন, তারপর শব্দ করে হেসে উঠলেন।
“কি ব্যাপার এমন কি হাসির খবর পেলেন?” কেউ একজন জানতে চাইল।
মিঃ জেনসেন নির্বিকার ভাবে তার দিকে খবরের টুকরোটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। সেই হাসির খবরটা এর ওর হাত ঘুরে চার্লির হাত হয়ে অদরকারী খবরের ফাইলে চলে গেল।
চার্লি সেদিন সারাদিন চেষ্টা করেও খবরটা খুঁজে পেল না, পেল তার পরের দিন দুপুরে।

খবরটা একটা ছোট্ট গ্রাম্য শহরের কুপার জ্যাকসন নামে একজন পঙ্গু মানুষের। মানুষটি সেই দুতিন বছর বয়স থেকে শয্যাশায়ী। গল্পটা এইরকম, কুপার জ্যাকসনের বাবা দাবী করেছেন যে কুপার যা চায় তাই ঘটাতে পারে। সে আজ যা ভাবে বা কল্পনা করে তার পরের দিন সেটা ঘটবেই ঘটবে। যেমন 'লিংক আব্রমস' এর কাণ্ডটা কালভার্টের ওপর দিয়ে জোরে গাড়ী চালানোর সময়ে দুর্ঘটনায় পড়ে তার গাড়ীটা ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে গেল অথচ তার গায়ে একটিও আঁচড় লাগল না। কিংবা ভালমানুষ রেভারেণ্ড অ্যামোস টাকারসের কাছে তার ভাই-এর চিঠি আসা, যার কোনও খবর কুড়ি বছর যাবৎ না পেয়ে তিনি চিন্তিত এবং দুঃখিত ছিলেন ইত্যাদি।

পরদিনই চার্লি জেনসেনের টেবিলে গিয়ে দাঁড়ালো।

"আমার ছুটি চাই। এমনিতেই এখন আমি সপ্তাহে ছদিন করে কাজ করছি, তাছাড়া গত বছরের একসপ্তাহের ছুটিও আমার পাওনা আছে। তাই আ—"

"ব্যাস ব্যাস।" তাকে কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিলেন জেনসেন। "আমাদের কাজের অবস্থা এখন ভালই, তুমি সাত কি দশদিনের জন্য যেখানে খুশী কেটে পড়তে পার।"



দুদিন পরে চার্লি ট্রেন থেকে উইসকনসিনের ছোট্ট গ্রাম্য শহরটাতে নামল, এবং প্রায় অবিশ্যাস্য ভাড়া দিয়ে শহরের উল্টোদিকের একটা লেকের ধারে একসার কেবিনের একটা ভাড়া নিল। একটু গুছিয়ে নিয়েই চার্লি শহরের ভেতর রওনা দিল খবরাখবর সংগ্রহ করতে। ওর উদ্দেশ্য ছিল কুপার জ্যাকসন সম্পর্কে খবর রাখেন এবং একজন বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য কোনও লোকের সন্ধান করা। সৌভাগ্যক্রমে পেয়েও গেল একজন তেমন ব্যক্তির সন্ধান। ডাক্তার এরিক অ্যামেস, যিনি শুধু কুপারের চিকিৎসকই নন সেই শহরের মেয়র এবং একজন সম্মানীয় মানুষ। চার্লি আরও একটা খবর শুনল যা শোনার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

খবরটা গত দুমাস ধরে ঐ ছোট্ট শহরটার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। 'কুপার জ্যাকসন' দীর্ঘদিন অসহায়ভাবে বিছানায় শুয়ে যাবার পর মাস দুয়েক হোল উঠে দাঁড়িয়েছে। যদিও একটা লাঠি লাগে তবুও সে দিব্যি চলাফেরা করছে, এখন প্রত্যেকদিন সে লেকের দিকে বেড়াতে যায় একা কারুর সাহায্য ছাড়াই।

শহরের লোকেরা অবশ্য বলতে পারেনি সেই বিশেষ দিনটার ঠিক কোন সময়ে সে প্রথম হাঁটতে শুরু করে। নিজেই হেঁটে লেকের দিকে যায় বেড়ায়, লেকের ধারের কেবিনগুলোর পর্যটকদের সঙ্গে গল্প করে। অনেকক্ষণ ধরে একটা হলদে ডানাওয়ালা কালো পাখিকে তার বাসার চারদিকে নেচে নেচে উড়ে বেড়াতে দেখে তারপর ফিরে আসে।

চার্লি অতএব পরদিন থেকে লেকের ধারে বসে কুপার জ্যাকসনের প্রতিক্ষায় থাকে। অবশেষে দূর থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে তাকে আসতে দেখে। আস্তে আস্তে কুপার জ্যাকসন এগিয়ে আসে, একবার উৎসুক চোখে চার্লির দিকে তাকায় তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা ভাঙ্গা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পরে।

একটু অপেক্ষা করে চার্লি উঠে পড়ে। সামান্য এদিক ওদিক করে স্বাভাবিক-ভাবে কুপার জ্যাকসনের পাশে গিয়ে বসে পড়ে বলে "আশাকরি কিছু মনে করবেন না ?"

"আরে নানা কি যে বলেন।" কুপার বলে "বরঞ্চ আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতে পারলে আমার ভালই লাগবে।"

অতঃপর চার্লি কুপারের সঙ্গে গল্পে জমে গেল। কুপারকে চার্লি কথায় কথায় জানায় সে একজন খবরের কাগজের কর্মী, সাত দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। একঘেঁয়ে বিরক্তিকর কাজের থেকে পালাতে পেরে তার দারুণ ভাল লাগছে, সে কুপারদের মতন লোকেদের রীতিমতো হিংসা করে যারা এই সুন্দর শান্ত শহরে থাকে।

চার্লি লক্ষ্য করে সে খবরের কাগজের লোক শুনে কুপারের কান দুটো শিকারী কুকুরের মত খাড়া হয়ে উঠেছে। সে চার্লিকে হাজারো রকমের প্রশ্ন করতে শুরু করল। যে সব প্রশ্ন সবাই একজন রিপোর্টার কিংবা খবরের কাগজের লোককে বাগে পেলে করতে থাকে।

ওমুক ঘটনাটা সম্পর্কে আপনার কি ধারনা, তমুকটা সম্পর্কে কি করা যেতে পারে। এই যুদ্ধবিগ্রহগুলো কিভাবে বন্ধ করা যায়, আচ্ছা আমরা এই যুদ্ধগুলো বন্ধ করার জন্য কি করতে পারি ? শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হবার জোগাড়।

তবে চার্লির মনে হোল কুপারের প্রশ্নগুলো আর সবার থেকে অনেক বেশী তথ্য নির্ভর, অনেক বেশী আন্তরিক। কুপার ওর প্রশ্নের জবাব পেতে সত্যিই উৎসুক, আর দশজনের মত বিদ্যাজাহির করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

চার্লিও আন্তরিক ভাবেই জানাল সে সত্যিই জানে না কিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যেতে পারে। তবে ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের ফলে সম্ভবত এখনই কোন বড় যুদ্ধ লাগবে না।

কুপারের চোখ চকচক করে উঠল “জানেন খবরের কাগজের রিপোর্টগুলো পড়তে পড়তে আমি ঠিক ঐ কথাই ভেবেছিলাম ? আমারও মনে হয়েছিল ঐ ঘটনা দুটো ঘটলে আপাতত যুদ্ধ লাগবে না।”
চার্লি পোর্টার যদি কপিরিডার না হয়ে একজন রিপোর্টার হোত তাহলে সে হয়ত সেই বিমান ভেঙ্গে পড়া কিংবা কুকুরটার আশ্চর্যরকমভাবে গুহা থেকে বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ করত। হয়ত সে বলত সে এমন একজনকে চেনে যে মিডনাইটের মতন কতগুলো অখ্যাত ঘোড়ার ওপর বাজী ধরে ধরে একটা বিরাট কোষাগার বানিয়ে ফেলতে পারে।
চার্লি কিন্তু সে সব কিছু বলল না।
চার্লি যদি ঘাগু রিপোটার হোত তাহলে সে কুপার জ্যাকসনকে হয়ত বলত “দেখ বাপু তোমার সব কাণ্ডকারখানা আমার নখদর্পনে। ভাল চাওত এই বেলা আমাকে তোমার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দাওত বাছাধন, যাতে আমি একটা দারুণ গল্প তৈরী করতে পারি।”
চার্লি এসব কিছুই বলল না, তার বদলে সে কুপারকে জিজ্ঞেস করল, সে কুপার জ্যাকসন নামে একজন অসুস্থ লোকের ম্যাজিকের মতন সেরে যাওয়ার গল্প শুনেছে এখানে এসে, সেই কি ঐ কুপার জ্যাকসন ?
কুপার হেসে জানায় হ্যাঁ সেই ঐ কুপার জ্যাকসন। হয়ত তার সেরে যাওয়াটা ম্যাজিকের মতই, তবে কিভাবে সে সুস্থ হোল সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই। তার ডাক্তার এরিক অ্যামোসের অবস্থাও তাই।
চার্লি ঘণ্টা দুয়েক বসে বসে কুপারের সঙ্গে কথা বলল তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিল।



পরের দিন কুপার খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার প্রিয় গাছের গুঁড়িটার কাছে এল, চার্লি ওটার ওপরেই বসে কুপারের জন্য অপেক্ষা করছিল।
সেদিনই একথা সেকথার ফাঁকে কুপার তার জীবনের গল্প চার্লিকে বলল। সে একেবারে পঙ্গু অথর্ব ছিল, চার্লিকে জানাল কুপার। তার মা তাকে বলেছেন মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই সে শয্যাশায়ী।
সে ছোটবেলা থেকেই গল্প শুনতে ভালবাসত, তার বাবা, মা দাদা দিদিরা তাকে যে সব গল্প বলত সেই সব গল্পই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল অসুখের প্রথম কটা বছর। ‘পিটার র‍্যাবিট’, ‘জিঞ্জারব্রেড ওয়ালা’, ‘ছোট্ট বোপিপ’ এর মত অনেক

সুন্দর মজার গল্প শোনার পর শুয়ে শুয়ে সারাদিন সে ঐ গল্পগুলোর কথাই ভাবত বার বার।

"এমন করতে করতে একদিন আমি নিজেই গল্প বানাতে শুরু করলাম। আমার সব গল্পের এবং কল্পনার হিরো ছিল পিটার র‍্যাবিট আর জিঞ্জারব্রেড ওয়ালা। তারা সব সময়ে একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারে যেত এবং অন্যান্য গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে তাদের দেখা হোত। তারা দুজনে মিলে এমন সব কাণ্ডকারখানা করত যা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"তবে" কুপার যোগ করল "ওদের কোন কাণ্ডকারখানাই আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হোতনা।"

"আস্তে আস্তে আমি এমন একটা বয়সে পৌঁছলাম যখন সব বাচ্চারা স্কুলে যায়। আমার বাবা মা আমাকে নিয়ে, আমার লেখাপড়া শেখা নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ডাক্তার অ্যামোস কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন লেখাপড়া শিখে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগানোর বয়সে আমি কোনদিনও পৌঁছুবনা। তিনি আমার বাবা মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আমাকে এমন কিছু শেখাতে যা আমার ভাল লাগবে। যেহেতু আমার একমাত্র আগ্রহ ছিল গল্প শোনায় তাই তাঁরা আমাকে পড়তে শেখালেন। যাতে গল্পগুলো পড়ে দেওয়ার জন্য কারুর ওপর আমাকে নির্ভর করতে না হয়। পড়তে শেখার পর কত গল্পই যে আমি পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আস্তে আস্তে পিটার র‍্যাবিট আর জিঞ্জারব্রেড ওয়ালার সঙ্গে আরও অনেক নতুন নতুন চরিত্র আমার কল্পনায় অনুপ্রবেশ করতে লাগল। প্রত্যেক দিনই আমার কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চারগুলো আরও আজগুবি আরও অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।"

"আপনার হয়ত মনে হোতে পারে এমন 'আজগুবি' কল্পনা করতে গিয়ে আমি কেন হাসতে হাসতে মারা পড়িনি। আসলে ওরা আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত।"

"তুমি এখন কি পড়ে সময় কাটাও ?" চার্লি জানতে চাইল।

"এই খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন এটা সেটা" কুপার বলল।

"মানে আমি ঠিক তা জিজ্ঞেস করিনি, আমি জানতে চাইছি তুমি কিভাবে অবসর বিনোদন কর ? ইয়ে—মানে পিটার র‍্যাবিটের জায়গায় এখন কে এসেছে ?"

কুপার একটু আমতা আমতা করে শেষ অবধি বলল, "আমি এখন সায়েন্স ফিকসন ম্যাগাজিনগুলো বেশী পড়ি। পাঁচ, ছ বছর আগে—উহুঁ আমার মনে হয় আট বছর আগে কেউ একজন প্রথম আমাকে একটা সায়েন্স ফিকসন ম্যাগাজিন এনে দিয়েছিল তারপর থেকেই—"

"আরে ! আমিও ওগুলোই পড়ি।" কুপারকে অস্বস্তি থেকে উদ্ধার করতে চার্লি বলল।

সেদিন সারা দুপুরটা ওরা সায়েন্স ফিকসন নিয়ে গল্প করল।

সেদিন রাত্রে চার্লি পোটার তার ছোট্ট কেবিনটায় শুয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল কিভাবে কুপার বছরের পর বছর বিছানায় শুয়ে শুয়ে শিশুদের তারপর কিশোরদের, সবশেষে সায়েন্স ফিকসনের চরিত্রগুলোকে নিয়ে সময় কাটিয়েছে।

শুয়ে থাকার একঘেয়েমি কাটাতে সে প্রথম প্রথম এটা সেটা নানা রকম বিষয় নিয়ে চিন্তা করত। ক্রমে তার কল্পনায় কতকগুলো চরিত্র ভেসে উঠতে লাগল। চরিত্রগুলো ছিল অস্পষ্ট ধোঁয়াটে আস্তে আস্তে সেগুলো সাদা কালো ছবির মতন স্পষ্ট আকার ধারণ করতে লাগল। যখন সে 'টম সইয়ার' কিংবা রবিনসন ক্রুসোর মতন চরিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে তখন সেগুলো সম্পূর্ণ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

জাকলবেরি ফিন, রবিনসন ক্রুসো থেকে সে এখন সায়েন্স ফিকসনে পেঁছে গেছে। ওঃ ভগবান, চার্লি ভাবল কুপার এখন সায়েন্স ফিকসন নিয়ে কল্পনা করছে।



একজন পঙ্গুমানুষ যে কোনদিন বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, সঠিক পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখেনি, মানবিক ধ্যান ধারণা সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই সে সায়েন্স ফিকসনের মতন একটা জটিলতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

সারাজীবন যে কতগুলো আজগুবি কল্পনার মধ্যে বিচরণ করেছে সে হঠাৎ খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন পড়ে পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে কি ঘটতে পারে?

তুমি একটা আস্ত পাগল, নিজেকেই নিজে বলল চার্লি তারপর শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

কুপার চার্লিকে পছন্দ করে ফেলল। ওরা সায়েন্সফিকসন, সেদিনের খবরা-খবর, কিভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। চার্লি বলল সে সত্যি জানে না কিভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। বহু অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই বিষয়ে প্রতিদিন চিন্তা করছেন, কিন্তু এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

"কারুর এ ব্যাপারে এমনই কিছু করা উচিত।" কুপার বলে উঠল। তার কথা শুনে মনে হোল সে যে কোনও মুহূর্তে এব্যাপারে কিছু করতে প্রস্তুত।

"চার্লি পরের দিন ডাক্তার অ্যামেসের সঙ্গে দেখা করল।

"আমি আপনার কথা কুপারের কাছে শুনেছি।" ডাক্তার হেসে বললেন।

"কুপারের সঙ্গে আমার দিনকয়েক হোল পরিচয় হয়েছে। আমার ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু করিনি।"

"আমি বুঝতে পারছি।" ডাক্তার অ্যামেস বললেন "মাস কয়েক আগে কুপার সম্পর্কে একটা ছোট্ট খবর কাগজে বেরিয়েছিল আপনি সেটার কথাই জানতে চান।"

"ঠিক তাই।" চার্লি উত্তর দিল, "আমি আরও জানতে চাই কিভাবে কুপার এতদিন বিছানায় শুয়ে থাকার পর হঠাৎ হাঁটতে শুরু করল ?"

"আপনি কি একটা গল্পের মালমশলা চাইছেন ?" ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

"না আমি গল্পের মালমশলা খুঁজছি না।"

"কিন্তু আপনি'ত একজন কাগজের লোক।"

"আমি গল্পের খোঁজে এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন সে ইচ্ছা আমার নেই। আমি—আমি এখন রীতিমত আতঙ্কিত।"

"আমিও।" ডাক্তার অ্যামেস বললেন।

চার্লি চমকে উঠল, তারপর বলল "আমি যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তা একটা গল্প হবার থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে।"

"আশাকরি, আমরা দুজনেই ভুল করছি।" ডাক্তার বললেন।

"কুপার এখন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।" চার্লি বলে চলল "বেশ কয়েকবার কুপার আমাকে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে নানারকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। আমি অবশ্য প্রতিবারই তাকে জানিয়েছি এব্যাপারে আমি কিছু জানি না, আমার মনেও হয় না কেউ জানে বলে।"

"সেটাই তো সমস্যা।" ডাক্তার অ্যামেস বললেন। "ও যদি শুধু ভেঙ্গে পড়া বিমান, কিংবা গুহায় আটকে পড়া কুকুর নিয়ে চিন্তা করত তাহলে ঠিক ছিল—"

"ওকি আপনাকে ঐ সব ব্যাপারে কিছু বলেছে ?" চার্লি উৎসুক হয়ে জানতে চাইল।

"না তেমন খোলাখুলিভাবে ও আমাকে কিছু বলে নি বটে তবে বলছিল যদি ঐ ভাঙ্গা বিমানের সব যাত্রীরা বেঁচে যায় তাহলে কি ভালই না হবে। আর গুহায় আটকে পড়া কুকুরটার ব্যাপারে ও ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। জন্তু-জানোয়ারদের ও ভীষণ ভালবাসে।"

"আমার মনে হয় কুপার এতদিন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে প্র্যাকটিস করে হাত পাকাচ্ছিল। এবারে ও বড় ব্যাপারে মন দেবে।"

একটু ধাতস্থ হয়ে চার্লি আবার বলল "কিন্তু তাকি সম্ভব ?"

"কুপার এব্যাপারে কারুর সাহায্য পাচ্ছে। ওকি তোমায় সে কথা জানায় নি ?" ডাক্তার জানতে চাইলেন।

চার্লি বিভ্রান্ত হয়ে মাথা নাড়ল।

"আসলে ও তোমাকে ভালভাবে চেনে না। আমি ওর চেনা একমাত্র লোক যাকে এধরনের কথা বলা চলতে পারে বলে ও মনে করে।"

"আপনি বলতে চান ও কারুর সাহায্য পাচ্ছে ? কেউ ওকে এব্যাপারে সাহায্য করছে ?"

"কেউ নয়।" ডাক্তার বললেন "কিছুতে"—

কুপার তাঁর সঙ্গে কি ধরনের কথাবার্তা বলত তা ডাক্তার আমেস চার্লিকে বললেন। বছর চার পাঁচ হোল সায়েন্স ফিকসন পড়তে আরম্ভ করার পর থেকে কুপার একটা কাল্পনিক মহাকাশ যান বানিয়ে কল্পনায় তাতে করে মহাকাশ পাড়ি দিতে শুরু করে। প্রথম দিকে সে আমাদের সৌর জগতের মধ্যেই ঘুরে বেড়াত। তারপরে ও তার কাল্পনিক যানের শক্তি বাড়িয়ে আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে বহু দূরের গ্রহনক্ষত্রে পরিক্রমা শুরু করে। তবে কুপার ওর কাল্পনিক ভ্রমনকে যেমন তেমন করে নয় খুবই যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাজাত। একটা কোনও গ্রহে গেলে আগে তার যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ভালভাবে জেনে তারপর আরেকটা গ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা হোত। এইরকম ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই কোনও এক সময় সে তার যানে কয়েকজন মানবাকৃতির সঙ্গী জুটিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে কুপারের কল্পনার মহাকাশ জগৎ তার কাছে বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে। এমনকি যে পৃথিবীতে সে বাস করছে তার থেকেও বর্তমানে ঐ মহাকাশ জগতই তার কাছে বেশী সত্যি। তার মহাকাশ ভ্রমনের কাল্পনিক সঙ্গীরা যারা অন্যো-কোনও গ্রহ থেকে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তারাও প্রথম দিকে ঝাপসা ছিল এখন জীবন্ত। ইদানিং কালে সে যেভাবে চাইত তার কল্পনাগুলো সেভাবে পরিচালিত হোতনা। সেগুলো আপনা থেকেই পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত, এবং পরিমার্জিত হয়ে যেত। সেই থেকেই এনিয়ে চিন্তিত হোতনা কারণ সে যতটা চিন্তা করতে পারত তার কল্পনাগুলো তার চেয়েও অনেক উন্নততর হোত।

অবশেষে একজন নয় এইরকম তিনজন কাল্পনিক সঙ্গীর সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

"তাহলে কি আপনি বলতে চান কুপার তার এই তিন সঙ্গীকে ভালভাবে চেনে ?"

"নিশ্চয়ই খুবই ভালভাবেই চেনে।" বললেন ডাক্তার "তবে তার মানে এই নয় যে সে তাদের সচক্ষে দেখেছে বা দেখবে।"

"আপনি এইসব কথা বিশ্বাস করেন ?" চার্লি জানতে চাইল।

"আমি জানিনা, আমি সত্যিই জানিনা কিন্তু কুপারকে আমি চিনি। আমি জানি সে হাঁটতে শুরু করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের—পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের এমন শক্তি ছিলনা তাকে হাঁটাতে পারে।"

"আপনি তার মানে মনে করেন কুপারের ঐসব কাল্পনিক বন্ধুরাই তাকে

সারিয়ে দিয়েছে ?"
"হয়তো দিয়েছে।"
"একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝছিনা, কুপার জ্যাকসনের মাথা ঠিক আছে তো ?"
"সম্ভবত সেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সুস্থ্য মস্তিস্কের লোক।" ডাক্তার অ্যামেস জানালেন।
"এবং সবচেয়ে বেশী বিপদ্জনক।" চার্লি বলল।
"হ্যাঁ সেই সম্ভাবনাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি যতদূর সম্ভব ওকে চোখে চোখে রাখি—"
"আর কতজনকে আপনি কুপারের ঘটনাটা বলেছেন ?" চার্লি জানতে চাইল।
"কাউকে নয়।"
"আর কাউকে এব্যাপারে কিছু বলবেন বলে ভেবেছেন কি ?"
না ! আমার আপনাকেও জানানো উচিত হয়নি। তবে আপনি নিজেই অনেকটা জানতেন। আপনি নিজে এব্যাপারে কি করতে চান ?"
"আমি বাড়ী ফিরে যাব এবং মুখে কুলুপ এঁটে থাকব।"
"ব্যাস আর কিছুনা ?"



"কিছুনা। যদি আমার প্রার্থনা করা অভ্যেস থাকত তাহলে প্রার্থনা জানাতাম। চার্লি সত্যিই বাড়ী ফিরে গেল, মুখ বন্ধ করে রইল কিন্তু তার দুশ্চিন্তা বন্ধ হলনা। এক এক সময়ে তার মনে হতে লাগল ডাক্তারের কথাগুলো একেবারেই অসম্ভব। পরমুহূর্তেই আবার মনে হোত কুপার সত্যিই ইচ্ছে করলে যা চায় তাই ঘটাতে পারে। কুপার জ্যাকসন কুড়ি বচ্ছর চিন্তা আর কল্পনা করে কাটিয়েছে। তার কল্পনাগুলো স্বাভাবিকভাবে রূপ পায়নি। আর দশটা মানুষের মতন সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে কোনদিনও চিন্তা করেনি সেখানেই ছিল তার সুবিধা আর সেটাই বিপদের।
কুপারের তিন রহস্যময় সঙ্গীর চিন্তাও থেকে থেকে চার্লির মনে উদয় হোত। সে ঐ তিনজনের মুখের চেহারাও কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেগুলো কখনই এক রকম থাকত না। শেষ অবধি চার্লি ওদের মুখের চিন্তা ছেড়েই দিল। তবে সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা ছিল চার্লির ঐ বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে। কুপার কিংবা কোনও লোক কিছু জানার বা ভাবার আগেই বিমানটা ভেঙ্গে পড়েছিল। কুপারের অলৌকিক শক্তির যাদু তাদের রক্ষা করার

আগেই বিমানের ভেতরের যাত্রীদের যা হবার হয়ে গিয়েছিল ঐ রকম কোন অলৌকিক যাদুর সাহায্য ছাড়া ভাঙ্গা বিমানটির যাত্রী ও কর্মীদের অক্ষত শরীরে বেঁচে থাকার কল্পনা একেবারেই অসম্ভব। এমন ঘটতেই পারে না। এর অর্থ কুপার শুধু যা খুশি তাই ঘটাতে পারে এমন নয় সে ইচ্ছে করলে সময়টাকেও পেছনে নিয়ে যেতে পারে, এবং যে ঘটনা অনেকদিন আগেই ঘটে গেছে তাকেও মিথ্যে করে দিতে পারে। হয় তাই অথবা সে মরা মানুষকে বাঁচাতে পারে। তাদের দেহের রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলোকে জুড়ে দিতে পারে এবং এই চিন্তা একটা ঘটে যাওয়া ঘটনাকে না ঘটতে দেওয়ার থেকেও বেশী পাগলামি।

চার্লি বার কয়েক ডাক্তার অ্যামেসে কে ফোন করল। ডাক্তার জানালেন সবঠিক আছে কুপার এখন রাশিকৃত নতুন পুরোনো সায়েন্সফিকসন ম্যাগাজিন পড়া এবং সেগুলোর থেকে নানা গল্প ও ঘটনার ক্যাটালগ করার নতুন হবি নিয়ে বেশ শান্ত ভাবেই আছে।

চার্লি যখন ফোনটা নামিয়ে রাখল তখন ওর হাতটা কাঁপছে সারা শরীর হিম হয়ে গেছে কারণ ও বুঝতে পারছে কুপার ঐ ম্যাগাজিন গুলো নিয়ে কি করবে।

সেই রাত্রেই চার্লি একগাদা সায়েন্সফিক্সন ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে বসল। প্রথম গল্পটা ওর এক প্রিয় লেখকের রচনা তবে তেমন বিপদজনক কিছু নয়। সেটা একজন পৃথিবীর মানুষের কথা যে দারুণ বিপদের মধ্যেও একটা মহাকাশ ঘাঁটিকে রক্ষা করে যাচ্ছে। পরের গল্পটা একটা নক্ষত্র যানের যেটা একটা অদ্ভুত মহাকাশ দুর্ঘটনার পরে অন্য এক বিশ্বে ছিট্‌কে পড়ল।

তৃতীয় গল্পটা ছিল এই রকম, পৃথিবীতে এক বিরাট যুদ্ধ লাগার উপক্রম হয়েছে, এবং পৃথিবীর এক নায়ক সেই সংকট কাটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বে বিদ্যুতের উৎপাদন সম্পূর্ণ রোধ করে।

চার্লি স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে রইল। ওর হাত থেকে বইটা মাটিতে পড়ে গেল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল সে এই ভেবে, শান্তিপাগল কুপার জ্যাকসনও হয়ত এই গল্পটা পড়েছে কিংবা পড়বে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে চার্লি উঠে ডাক্তার অ্যামেসকে আবার ফোন করল।

""চার্লি আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন কুপারকে পাওয়া যাচ্ছে না।" কাঁপা গলায় বললে ডাক্তার অ্যামেস।

"পাওয়া যাচ্ছে না ?"

"আমি ঘটনাটা চেপে রেখেছি কুপার সম্বন্ধে কোন গুজব ছড়াচ্ছিনা তাতে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে।"

"আপনি কি ওর খোঁজ করছেন ?"

"আমরা ওর খোঁজ করছি।" ডাক্তার বললেন "যতটা সম্ভব হৈচৈ না করে। সারা

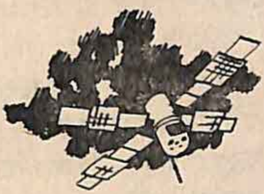
গ্রামটা চষে ফেলা হয়েছে। পুলিসে, মিসিং পার্সেনস্ বিভাগে খবর দিয়েছি।"
"ওকে আপনার খুঁজে বার করতেই হবে ডাক্তার।"
"আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করছি।" ক্লান্ত ভাবে ডাক্তার অ্যামেস জানালেন।
"কিন্তু ও কোথায় যেতে পারে?" চার্লি বলল "ওর কাছে নিশ্চই খুব বেশী টাকা নেই, আছে কি? টাকা ছাড়া বেশীদিন কোথাও লুকিয়ে থাকা—"
"কুপার চাইলে যে কোন মুহূর্তে টাকা জোগাড় করে নিতে পারে। যে কোনও জিনিসই ও জোগাড় করে নিতে পারে।"
"আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চান।"
একটু থেমে চার্লি আবার বলল "আচ্ছা আর কি কিছু করার—"
"নাঃ আর কিছুই করার নেই, কারুরই কিছু করার নেই।" হতাশ ভাবে বললেন ডাক্তার, "আমরা শুধু অপেক্ষাই করতে পারি।"
এটা বেশ কয়েক মাস আগের ঘটনা। তারপর থেকে চার্লি প্রতীক্ষা করে চলেছে।
কুপার এখনও নিখোঁজ, তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।
চার্লির উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষারও কোন বিরাম নেই।
যে জিনিসটা চার্লিকে এখন সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে তা হোল কুপারের স্বাভাবিক শিক্ষা ও সাধারণ বুদ্ধির অভাব।
একটা ক্ষীণ আশা অবশ্য আছে, কুপার যদি সত্যিই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মতলব করে তাহলে সে বিশ্বের বিদ্যুৎ ব্যবহারকে ধ্বংস করে দেবেনা শুধু সময়টাকে পেছিয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষের বিদ্যুতের আবিষ্কারকে নাকচ করে দেবে।
কিন্তু চার্লির আশঙ্কা কুপার সময়কে পেছিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। তার ভয় কুপার অনুধাবন করতে পারবে না যে সে যখন বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে নাকচ করতে যাবে তখন শুধু তারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ এসে আলো জ্বালায়, কলকারখানা চালায় তাকেই ধ্বংস করবে না সমস্ত বিশ্বর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে ফেলবে। শুধু বিদ্যুৎকে নষ্ট করতে গিয়ে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদানকে নষ্ট করে ফেলে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় আনবিক ভারসাম্যের উপর আঘাত হানবে। তার ফলে শুধু আমাদের পৃথিবী কিংবা সৌরমণ্ডলই নয় সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাবে।
চার্লি অতএব বসে বসে শঙ্কিত চিত্তে প্রতীক্ষা করে তার চেয়ারের পাশের অলোটা কখন দপ্‌দপ্ করে ওঠে।
অবশ্য চার্লি এও বোঝে, সেই অন্তিম মুহূর্ত যখন আসবে তখন আলোটা আর দপ্‌দপ্‌ও করবে না।

অনুবাদঃ মুকুতা মুখোপাধ্যায়

এ ই ভ্যান ভগ

সম্ভ্রান্ত ডাচ পরিবারে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে উইনিপেগে জন্ম হয় ভ্যান ভগের। পুরো নাম আলফ্রেড এলটন ভ্যানভগ। খুব ছোট বয়েসেই অবস্থার পরিপাকের জন্য ওকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। রোজগারের জন্য নিযুক্ত হয়ে পড়তে হয় বিভিন্ন রকম দৈহিক এবং মানসিক কর্মের মধ্যে। কিন্তু এরমধ্যে ও ভ্যান-ভগ অবসর সময়গুলো আজেবাজে ভাবে না কাটিয়ে লেখায় মনোনিবেশ করতেন। সাহিত্য জগতে ভ্যান ভগের পদার্পণ বিজ্ঞানের লেখক হিসেবে নয়। তার প্রথম গল্প ব্ল্যাক ডেন্ট্রয়ার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় প্রকাশিত হয়। লেখকের লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে স্লান বিখ্যাত। প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ভ্যান ভগের লেখার গতি অনেক কমে যায়। কারণ তার চোখের গোলমাল দেখা দেয়। এরপর থেকে উনি অনেক কষ্ট করে লিখতেন। চতুর্থ বিশ্ব সাইন্স ফিকসন কনভেনসনের (১৯৪৬) তিনি ছিলেন সম্মানিত অতিথি।

ভ্যান ভগের প্রকাশিত কিছু বই ঃ স্লান ('৪৬), দি ওয়েপন মেকারস ('৪৬), দি ওয়ারলড অফ নাল-এ ('৪৮), আউট অফ দি আননোন ('৪৮), দি হাউস দ্যাট ষ্টুড স্টিল ('৫০), দি ওয়েপন সপস্ অফ ইশার ('৫০), ডেষ্টিনেশন ইউনিভার্স ('৫২), এ্যায়য়ে এণ্ড বিয়ণ্ড ('৫২), দি মিস্কড মেন ('৫২), দি ইউনিভার্স মেকার ('৫৩), প্ল্যানেটস্ ফর সেল ('৫৪), দি পাওয়ারস অফ নাল-এ ('৫৬), এম্পায়ার অফ দি অ্যাটম ('৫৭), দি মাইণ্ড কেজ ('৫৮), দি ওয়ার এগেইনষ্ট দি রুল ('৫৯), দি উইজারড অফ লিন ('৬২), দি বিষ্ট ('৬৩), রোগন শিপ ('৬৫), দি উইংগড ম্যান ('৬৬), দি ফার আউট ওয়ার্ল্ড অফ এ-ই ভ্যান ভগ ('৬৮), দি সিলকাই ('৬৯), কোয়েষ্ট ফর দি ফিউচার ('৭০), দি বেষ্ট অফ এই ভ্যান ভগ ('৭০), চিলড্রেন অফ টুমরো ('৭০), দি ব্যাটল অফ ফরএভার ('৭১), ডার্কনেস অন ডায়ামণ্ডিয়া ('৭২)।



ডরমাণ্ট

দ্বীপটা পুরোনো। জিনিসটা পড়েছিল এই দ্বীপেরই জলরেখার দূর প্রান্ত-সীমায়। খোলা সমুদ্রের ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে এসে ধুয়ে দিত তাকে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে তার যখন জীবন ছিল তখন কি সে ভাবতে পেরেছিল, আদিযুগের মৃত্তিকাই এখানে স্ফীত হয়ে রয়েছে ?

দ্বীপটা কম বেশি তিন মাইল লম্বা। আর চওড়ায় বড়জোর কোথাও কোথাও মাইলখানেক হবে। একটা নীল লেগুনের চারপাশে সে টানটান হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সমুদ্রের ফেনায় ক্ষয়ে যাওয়া তার পাথুরে হাত-পাগুলো দ্বীপটির পায়ের আঙুলের মতো দিকটায় বিশাল এক মানুষের মতো ঝুঁকে পড়েছে পা ছোঁয়ার ভঙ্গিতে। সেই হাত-পা-এর আঙ্গুলের ফাঁকের মতো খাঁজকাটা জায়গা-টিতে সমুদ্র এসে ঢুকে পড়েছে।

জল এসে ধাক্কা দিচ্ছে সেই গিরিখাতের দেয়ালে। ঢেউ এসে অনবরত জোরে আছড়ে পড়ায় সৃষ্টি হচ্ছে বেসুরো এক কলধ্বনি।

প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা জলের এই কর্কশ গর্জনের কেন্দ্রস্থলই পড়ে আছে ইলিয়া। এখন চিরদিনের জন্য সুপ্ত। কাল এবং বিশ্বজগৎ কেউই তাকে মনে রাখে নি।

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকের কথা। কয়েকটি জাপানী জাহাজ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঝড়ঝঞ্ঝাবিপদ কাটিয়ে এই শান্ত হ্রদের ভেতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

সে সময় একটি জাহাজ থেকে একজোড়া সন্ধানী চোখ আতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কোথায় সেই জিনিসটি। সেই চোখের মালিকটি ছিল একজন সরকারী কর্মচারী। সরকার চাইত না তার কর্মচারীরা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোন দুঃসাহসিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ুক।

ইঞ্জিনীয়ার টাকু ওনিলো তাই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, এই প্রণালীর মুখে প্রায় চারশ ফুট লম্বা এবং নব্বই ফুট চওড়া কঠিন শিলার মত এক কঠিন চকচকে জিনিস রয়েছে।

এই ক্ষুদে হলদে রঙের লোকেরা সেখানে মাটির নীচে গ্যাস ও তেলের ট্যাংক তৈরী করে চলে গিয়েছিল। তারপর কত লক্ষ লক্ষ ঢেউ এসে ধুয়ে দিল জায়গাটা। কেটে গেল দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। কালের করাল গ্রাস থেকে কেউ রক্ষা পায় না। এ জায়গাটিও পায় নি। মানুষের শত কীর্তির মত এই কীর্তিটিও সমুদ্রের ঢেউ ও জলবৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেল। কঠিন মাটি পাথরের বুকে যেখানে মেশিনপত্র ছিল সেখানে গজিয়ে উঠল সবুজ গাছগাছড়া। যুদ্ধ শেষ হল, মাটির নীচের তেলের ট্যাংকগুলো আরো কিছুটা নীচে গেড়ে বসল। কয়েকটি মেইন পাইপে ফাটল দেখা দিল। আস্তে আস্তে ট্যাংকের তেলগুলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে গেল। কয়েক বছর ধরে দেখা গেল লেগুনের জলে হলদে-সবুজ তেল রোদে ঝিকমিক করছে।

কয়েক শ' মাইল দূরে বিকিনি অ্যাটল দ্বীপ এলাকায় পর পর দুবার বিস্ফোরণ ঘটল। তেজস্ক্রিয় জলের জটিল কারুকার্য শুরু হল। ১৯৪৬ সালে শরৎকালের গোড়ার দিকে সেই শক্তিশালী জ্বালানীর প্রথম চোঁয়ানি এসে পেঁছুল দ্বীপটিতে।

প্রায় দুবছর পরে একজন কেরাণী টোকিওয় বসে জাপানী নৌবাহিনীর পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে খুঁজে বের করল সেই তেলের ট্যাংকগুলোর অস্তিত্ব। আরো দু বছর পরে ১৯৫০ সালে কলশন নামে ডেস্ট্রয়ারটি রওনা দিল জায়গাটা খুঁজে বের করে তেলের ট্যাংকগুলো পরীক্ষা করে দেখতে।

দুঃস্বপ্নের প্রহর শুরু হল সেই থেকে।

দূরে থেকে দ্বীপের দিকে বাইনোকুলার দিয়ে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন লেফটেনাণ্ট কীথ মেনার্ড। অস্বাভাবিক কিছু দেখবার জন্যে মনে মনে তৈরী ছিলেন বটে। কিন্তু যা আশা করেছিলেন তাই হল। সেই একঘেয়ে দৃশ্য। বিড়বিড় করে বলছিল, "সেই ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল, সারা দ্বীপ জুড়ে ঢিবির মত পাহাড় আর গাছপালা···"। বলতে বলতেই থেমে গেলেন তিনি।

ওটা কি ? ঐ যে উপকূলরেখার কাছেই পাম গাছের ভেতর দিয়ে একটা চওড়া ফসলের ক্ষেত। ফসলের গাছগুলো পাশের একটি হাল দেয়া ঘাসে ঢাকা নীচু

জমিতে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। এই খাঁজকাটা জমিটা চওড়ায় প্রায় একশ ফুট হবে। উপকূল থেকে একটা পাহাড়ের একপাশে উঠে গেছে। সেই পাহাড়ের চূড়ার কাছেই একটি বিরাট পাথর মাটিতে আধ-চাপা হয়ে পড়ে আছে।

হতচকিত হয়ে মেনার্ড দ্বীপের জাপানী ফোটোগ্রাফগুলোর দিকে এবার চোখ বুলিয়ে নিল। পাশেই ছিল লেফটেনাণ্ট গার্সন। মেনার্ডের কার্যনির্বাহক অফিসার। তার দিকে ফিরে বললো, "আশ্চর্য ! পাথরটা ওখানে গেল কি করে ? ছবিতে তো ওটা নেই !" বলে ইনিজের ভুল বুঝতে পারল মেনার্ড। কাঁধ ঝাঁকিয়ে যথারীতি চাপা রাগ দেখিয়ে বলল, "হতে পারে আমরা হয়ত ভুল দ্বীপে এসেছি।"

মেনার্ড একথার কোন জবাব দিল না। গার্সনকে তার এক অদ্ভুত চরিত্র বলে মনে হোল। জিভ থেকে সব সময়েই যেন ব্যঙ্গবিদ্রূপ ঝরে পড়ছে।

"আমার মনে হয় এর ওজন লক্ষ টনের মত হবে। জাপানীরা আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য ওটা ওখানে টেনে নিয়ে গেছে।"

মেনার্ড এবারও কিছু বলল না। প্রথম মন্তব্য করেছে বলে নিজের ওপরেই রাগ হলো এবার তার। কেন যে ছাই ওকথা বলতে গিয়েছিল। আরো বিরক্ত লাগলো এই ভেবে যে সে সত্যি পাথরটার সঙ্গে জাপানীদের সম্পর্কের কথাটা একবার ভেবেছিল। গার্সনের দেয়া ওজনের হিসেবটা মোটামুটি সঠিক বলেই তার মনে হোল। কুড়ি লক্ষ টনের এক বিশাল পাথরকে যদি জাপানীরা তুলে নিতে পারে তাহলে যুদ্ধে জেতা তো তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তবু ব্যাপারটা মেনার্ডের বেশ অদ্ভুতই মনে হোল। ভাবল, পরে খতিয়ে দেখবে বিষয়টা।

চ্যানেলটা পেরিয়ে দ্বীপের কাছে পৌঁছুনোর পথে কোন ঘটনা ঘটল না। জাপানীদের বিবরণ পড়ে যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক গভীর আর চওড়া মনে হলো চ্যানেলটা। লেগুনে থাকতে থাকতেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিল ওরা। মেনার্ড খেয়াল রেখেছিল জলের ওপর তেল ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সতর্ক করে দিল ডেস্ট্রয়ারের ওপর থেকে কেউ যেন দেশলাইয়ের কাঠি না ফেলে। অন্য অফিসারদের সঙ্গে সামান্য আলোচনা করে সে ঠিক করল, তাদের ওপর দেয়া কাজটা শেষ করে লেগুনটা পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তেলে আগুন ধরিয়ে দেবে।

প্রায় দেড়টা নাগাদ ডেস্ট্রয়ার কলশন থেকে নৌকা নামিয়ে দেয়া হল। খুব দ্রুত তারা তীরে পৌঁছে গেল। জাপানীদের ব্লুপ্রিণ্টের সাহায্যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভুগর্ভে প্রোথিত চারটি ট্যাংক তারা সহজেই খুঁজে বের করল। ট্যাংক-গুলোর আয়তন পরিমাপ করতে বরং সময় লাগল। দেখা গেল, এর মধ্যে তিনটি ট্যাংকই খালি। সবচেয়ে ছোট ট্যাংকটিতেই শুধু হাই-অক্টেনের পেট্রোল ছিল। নিশ্চিদ্র অটুট অবস্থায় তার ভেতরটা পেট্রোলে ভরা। সেই পেট্রোলের মূল্য হবে

সতের হাজার ডলারের মত। এত কম অংকটা যে আশেপাশেযেসব নৌবাহিনীর বড় বড় ট্যাংকার সমুদ্রের জলে পড়ে থাকা জাপানী ও আমেরিকান জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিচ্ছে তাদের নজরে পড়বার মত নয়। মেনার্ডের ধারণা হল, এই পেট্রোল উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা লাইটার জাহাজ পাঠানো হবে। কিন্তু সেসব তার ভাববার কথা নয়।

খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ হলেও মেনার্ড যখন পরিশ্রান্ত অবস্থায় ডেকের দিকে এগোল তখন সবে সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে। তাকে বোধ হয় বেশ একটু ক্লান্তই দেখাচ্ছিল। নইলে গার্সন এত জোরে বলে উঠবে কেন, "কী হলো, খুব ক্লান্ত ?"

মেনার্ডের মনোভাব কঠিন হয়ে উঠল। গার্সনের এই মন্তব্যই তাকে পেঁছে দিল স্থির সিদ্ধান্তের দিকে। না, কিছুতেই ঐ শিলা অভিমান স্থগিত রাখা হবে না। রাতের খাওয়ার পর সে ডেকে পাঠাল, কে কে নিজের ইচ্ছায় এই অভিযানের সঙ্গী হবে এসো। তখন চারদিক নিকষ অন্ধকারে ঢাকা। সাতজন লোক, বসেনস মেট ইওয়েল এবং মেনার্ডকে নিয়ে নৌকা দীর্ঘ উষ্ণীষ পামবীথি ঘেরা তীর ভূমিতে গিয়ে লাগল। নৌকো থেকে নেমে তারা দ্বীপের ভেতরে ঢুকে পড়ল।



আকাশে চাঁদের দেখা নেই। সবে বর্ষার মরশুম শেষ হয়েছে। নির্জলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারারা ছড়িয়ে ছিল। নীচের হাল চষা জমি খাতে গাছগুলো আক্ষরিক অর্থেই যেন গাছগুলো লাঙল দিয়ে মাড়িয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের ক্ষীণ ফ্যাকাশে আলোয় দেখা গেল, অসংখ্য গাছগাছড়া পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সমান করে দেয়া হয়েছে। দৃশ্যটা অস্বাভাবিক ঠেকল।

মেনার্ড শুনতে পেল, দলের একজন বলছে, "কোন সামুদ্রিক ঘূর্ণি ঝড়-টড়েই এরকম হয়ে থাকবে।" মেনার্ডের ধারণা হল, শুধু ঘূর্ণিঝড় নয়, সেই ঝড়ের পরে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডও এই চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কিন্তু তাই বা কি করে হয় ? যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, কোন ঝড়ের পক্ষে কি কুড়ি লক্ষ টন ওজনের একটি শিলাকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারশো ফুট উঁচুতে সিকি মাইলের একটি লম্বা পাহাড়ের ঢালে তুলে নিয়ে যেতে পারে ? কাছ থেকে পাথরটাকে এবড়োখেবড়ো এক গ্র্যানাইটের মত মনে হল। ফ্ল্যাশলাইটের অনুজ্জ্বল আলোয় এর গায়ে অসংখ্য গোলাপী ডোরা চিকচিক করে উঠল। মেনার্ড তার দলবল নিয়ে পাথরের পাশে গেল। চারশ ফুট লম্বা পাথরটি

চড়তে চড়তে সে টের পেল কী বিশাল এই শিলাস্তূপ। শিলাগাত্রের মৃদু রশ্মিরেখার দীপ্তির দিকে তাকাতে গিয়ে তার মনে হল খাড়া পাহাড় যেন তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। শিলাটির ওপরের প্রান্ত মাটির গভীরে পোঁতা থাকলেও তার মাথার ওপরে প্রায় পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত বেরিয়ে আছে।

অস্বস্তিকরভাবে গরম হয়ে উঠেছিল রাতটা। মেনার্ডের খুব ঘাম হচ্ছিল। ক্লান্ত অবস্থাতেও তার এই ভেবে একটু সুখ হচ্ছিল যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায় তাকে কাজ করতে হচ্ছে। রাত্রির ভয়ঙ্কর আদিম নিস্তব্ধতার মধ্যে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল মেনার্ড। পরমুহূর্তেই আদেশ দিল, "পাথরটার কয়েক জায়গা থেকে নমুনা ভেঙ্গে নাও ; গোলাপী রঙের ডোরাগুলো কিন্তু বেশ লাগছে দেখতে।"

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। হঠাৎ একটি আর্ত চীৎকারে খান খান হয়ে গেল অন্ধকার নিস্তব্ধতা। ফ্ল্যাশলাইটের মিটমিটে আলোয় তারা দেখতে পেল সিম্যান হিকসের শরীরটা পাথরটির পাশে মাটিতে পড়ে মোচড় দিচ্ছে। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল তার পুরো হাতটা পুড়ে গেছে। আর কবজিটা আগুনে পোড়া তুষের মত কালো হয়ে উঠেছে।

হিকস ইলিয়াকে ছুঁয়েছিল।

মেনার্ড হিক্‌সকে দ্রুত মরফিয়া দিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দিল। সদর দপ্তরের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করা হল। সেখান থেকে একজন সার্জেন কী করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিল। ঠিক হল, হিকসকে নিয়ে যাবার জন্য একটা হসপিটাল বিমান পাঠানো হবে। কী করে দুর্ঘটনাটা ঘটল তা নিয়ে সদর দপ্তরে সম্ভবত কিছুটা বিহ্বলতার ভাব দেখা দিয়েছিল। কেননা "তপ্ত" শিলাটি সম্পর্কে তাঁরা বিস্তৃত তথ্য চেয়ে পাঠালেন। ভোর হতে না হতেই সদর ঘাঁটির অফিসাররা একে উল্কাপিণ্ড বলে অভিহিত করলেন। উর্ধ্বতন অফিসারদের মতামত নিয়ে মেনার্ড এমনিতে কখনো প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু শিলাটিকে উল্কাপিণ্ড হিসেবে সনাক্ত করাটা তার পছন্দ হল না। সে জানাল, উল্কাপিণ্ডটির ওজন ২০ লক্ষ টন এবং তা পড়ে আছে দ্বীপের মাটির ওপরেই। সে বলল, "এর তাপ নেবার জন্য একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার অফিসারকে পাঠাবো।"

ইঞ্জিনরুমের থার্মোমিটার দিয়ে শিলাটির বাইরের তাপমাত্রা দেখা গেল আটশ ডিগ্রী ফারেনহাইট। সদরদপ্তরকে জানাল ব্যাপারটা। আর ভয়ে তখনি সাদা হয়ে গেল মুখ, কেঁপে উঠল শরীর। এক প্রশ্নের জবাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা ঃ "জল থেকে অল্প তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাচ্ছে। তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। সেরকম হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে লেগুন ছেড়ে চলে গিয়ে তোমাদের জাহাজের জন্য অপেক্ষা করব। ওই জাহাজে তো বিজ্ঞানীরা থাকবে।"

কথাটা বলেই ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝতে পারল যেন হঠাৎ। ন'জন লোক সহ সে এখন ভয়ংকর মারাত্মক বিপদের এলাকার মধ্যেই রয়েছে। এমনকি আধ মাইল দূরে কলশনও এই বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

কিন্তু ইলেকট্রোস্কোপের সোনার পাতাগুলো নড়াচড়া করল না। জীগার–মুলার কাউন্টারটিও শুধু জলে ধরলেই কেবল শব্দ করছিল। এবং তারপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেই শুধু কুকুর-কু শব্দ বেরুচ্ছিল। আশ্বস্ত হয়ে মেনার্ড সিম্যান হিকসকে আবার দেখতে গেল। আহত হিকস অস্থির অবস্থায় শুয়ে ছিল। কিন্তু সে যে মারা যায় নি সেটাই একটা শুভ লক্ষণ। হসপিটাল বিমানটি ততক্ষণে এসে পড়েছে। সেখান থেকে একজন ডাক্তার নেমে এলেন। হিকসকে পরীক্ষা করলেন। ডেণ্ট্রয়ারের সকলের রক্তকণিকা গণনার পরীক্ষা করা হল। ডাক্তারটি তরতাজা হাসিখুশি এক তরুণ। ডেকে নেমে মেনার্ডের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "ওরা যা সন্দেহ করছে তা নয়। সবাই ভালো আছে। এমন কি হিকসও। কিন্তু মাত্র ৮০০ ফারেনহাইট তাপে তার হাতটা খুব তাড়াতাড়িই পুড়ে গেছে বলতে হবে।

মেনার্ড বলল, "মনে হয় ওর হাতটা ওতে আটকে গিয়েছিল।" বলেই সমগ্র দুর্ঘটনাটার কথা মনে মনে ভাবতে ভাবতে মেনার্ড ভয়ে কেঁপে উঠল। ডাঃ ক্লাসন বললেন, "ওটাই সেই পাথর? আশ্চর্য, এটা ওখানে গিয়ে উঠল কি করে!"

পাঁচ মিনিটও হয় নি, তারা সেখানেও দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় ডেক থেকে একটা চাপা আর্তনাদ এই দূর দ্বীপ ও লেগুনের নিস্তব্ধ বাতাসে বেসুরো হয়ে বেজে উঠল।

ইলিয়ার আপন অস্তিত্বের গভীরে একটা আলোড়ন উঠল। কী যেন সে করতে চেয়েছিল? না, কিছু মনে পড়ছে না তার।

সেই ১৯৪৬-এর শেষের দিকে সে যখন প্রথম বাইরের একটি শক্তির চাপটা অনুভব করল তখন এরকমই একটা ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে। সেদিন স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়ে সে নড়েচড়ে বসেছিল। বাইরের স্রোতপ্রবাহে হেরফের ঘটে একসময় তা একদম কমে গেল। অস্বাভাবিক ক্ষীণ হয়ে গেল তার ধারা। গ্রহের কঠিন আবরণটা তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বটে। কিন্তু তার ভেতরের সুপ্ত শক্তি তখনো জ্বলন্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি পুরোপুরি। আস্তে আস্তে ইলিয়া বুঝতে পারল, তার চারপাশের পরিবেশে কী বিপর্যয় ঘটে গেছে। প্রথমে সে ভেতরে ভেতরে এতটা নিস্তেজ ম্লান হয়ে গিয়েছিল যে চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ দেখা দেয় নি। সে অবস্থাটা আস্তে আস্তে কাটল। কতকটা জোর করেই সে তার পরিবেশ সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠল। রাডারের চোখ দিয়ে চারপাশের অদ্ভুত পৃথিবীটার দিকে সে ঘুরে দেখল। একটি পাহাড়ের চূড়ায় এক অগভীর

অধিত্যকায় সে পড়েছিল। তার স্মরণকালের মধ্যে এমন নির্জন নিঃসাড় পরিবেশ সে দেখে নি। না কোন মৃদু আলো, না আণবিক অগ্নিশিখার চাপ, না ফুটন্ত শৈলের বুদ্বুদ, না ভেতরের কোন সুপ্ত শক্তি প্রচণ্ড শব্দে আকাশমুখী বিস্ফোরণ—কিছুই তার চোখে পড়ল না।
নিঃসীম সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ হিসেবে সে যা দেখল তার কথা ভাবল না সে। সমুদ্রের তলায় এবং ওপরে—দুটি দেশই সে দেখতে পেল। কিন্তু তার আল্ট্রা শর্ট ওয়েভ দৃষ্টিতে জল দেখতে পেল না। বুঝতে পারল, সে এখন এমন এক প্রাচীন ও মৃতপ্রায় গ্রহে রয়েছে যেখানে প্রাণের চিহ্ন নেই। একটি বিস্মৃত গ্রহে একা থাকা এবং মৃত্যুবরণ করার কষ্ট মেনে নিতে সে রাজী। তবু যদি সেই শক্তি যা তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। যে দিক থেকে আণবিক শক্তির স্রোত আসছে সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে সে পাহাড় থেকে সেই দিকেই নামতে শুরু করল। কোন রকমে সে নীচে নেমে এল। এরপর ওপরের দিকে যাত্রা শুরু করল। পাহাড়ের উল্টো পিঠে কি আছে তা দেখবার জন্য সে সবচেয়ে কাছের চূড়াটার দিকে গেল।



লেগুনের অদৃশ্য অচেতন জলরাশি থেকে নিজেকে সামনের দিকে চালিয়ে নেবার সময় দুটি বিপরীতধর্মী ঘটনা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করল। আণবিক শক্তির জলবাহী বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে তার সমস্ত রকম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল। সেইসঙ্গে জল তার শরীরের নিউট্রন ও ডিউটেরণ তৎপরতায় বাধা দেবার কাজ বন্ধ করল। তার জীবন এক বর্ধিত গভীরতা লাভ করল। শ্বাসরোধকর যে প্রবণতা ধীরে ধীরে কাজ করছিল তা বন্ধ হল। তার সুগঠিত শরীর নিজের শক্তিতে বেঁচে থাকা বর্শার ফলার মত হয়ে দাঁড়াল। যে পদার্থ দিয়ে তা গঠিত তার স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তা বেঁচে থাকতে পারে। ইলিয়া আবার ভাবল, "আমাকে একটা কিছু একটা করতে হবে।"
ঘটনাগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করতেই বিশাল কিছু সেলের মাধ্যমে ইলেকট্রনের প্রবাহ বাড়ল। স্মরণে যখন কিছুই এল না তখন আস্তে আস্তে ক্রমশ সেই প্রবাহ কমে গেল। জীবনশক্তি ভগ্নাংশ পরিমাণে বাড়ায় পরিস্থিতিটা সঠিক ও ব্যাপক-ভাবে উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব হল। তার শরীর থেকে প্রত্যক্ষ তড়িত-চুম্বকীয় (ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক) তরঙ্গ চাঁদ, মঙ্গল এবং সৌর মণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে প্রবাহিত হল। যে প্রতিধ্বনি ফিরে এল তা থেকে শংকাজনক এক পরিস্থিতিই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তা হল এই যে গ্রহান্তরেও মৃতদেহ রয়েছে।

এক মৃত সৌরমণ্ডলের চৌহদ্দির মধ্যে সে বন্দী হয়ে থাকল। ততক্ষণ যতক্ষণ না তার পার্থিব কাঠামোটা তার এই তীব্র শ্রান্তিতে তার এই জলবন্দী হয়ে থাকা গ্রহের নিষ্প্রাণ ঊষর জড়পিণ্ডের সঙ্গে আর একবার সংস্পর্শে এনেছিল। এখন সে বুঝতে পারছে তার মৃত্যু হয়েছিল। কীভাবে তা এখন সে স্মরণ করতে পারছে না। কেবল মনে পড়ছে, সেই তীব্র বিস্ফোরক ধাতব পদার্থটি তার চারপাশে উদ্গিরণ করছিল। তাকে চাপা দিয়ে তার জীবনের পরমায়ু ছেঁটে ফেলেছিল। এক্ষেত্রে আণবিক রসায়নের যে প্রকাশ ঘটেছে এক নির্দোষ পদার্থের আকারে শেষপর্যন্ত পরিবর্তিত রূপ নেবে যা তাকে আর বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু তার আগেই তার মৃত্যু হল।

এখন সে আবার জীবিত। কিন্তু এত ক্ষীণ সেই জীবনের স্পন্দন যে পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করতেই হবে। প্রতীক্ষা সে করেছিল। ১৯৫০ সালে সে লক্ষ্য করেছিল ডেন্ট্রয়ারটি আকাশপথে তার দিকে ভেসে আসছে। সেই ডেন্ট্রয়ারের গতি থেমে যাবার এবং ঠিক তার নীচে দাঁড়াবার অনেক আগেই সে আবিষ্কার করেছিল এটা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন জীবন-প্রতিরূপ নয়। এখানে ভেতরে ভেতরে যে উত্তাপ তৈরী হচ্ছে তা এর বাইরের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। আগুনের অস্পষ্ট দীপ্তিও সে দেখতে পেল।

সেদিন সারাদিন ধরে ইলিয়া সেই জীবটি যাতে তার সম্পর্কে অবহিত হয় তার জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু কোন জীবনস্পন্দনই তার থেকে বেরুল না। তবু অধিত্যকার ওপরে আকাশের দিকে সে ভেসে রইল। এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, এ তার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে। ইলিয়ার জল সম্পর্কে কোন বোধ ছিল না। বাতাস যে কী তাও কল্পনা করতে পারত না। মানুষের শরীরের ভেতর দিয়ে তার আল্ট্রা-ওয়েভ এমনভাবে চলাচল করত যেন তাদের অস্তিত্ব নেই। অতএব প্রতিক্রিয়া বলতে একটাই এমন একটি অস্বাভাবিক জীবন-রূপ এখানে রয়েছে চারপাশের মৃত পৃথিবীর সঙ্গে যে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

ইলিয়া ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। গ্রহের স্থলভাগের ওপরে জিনিসটা অবাধে চলাফেরা করছে। কোথাও কোন আণবিক শক্তির উৎস রয়েছে কিনা তা সে জানতে পারবে। সমস্যা হচ্ছে এর সঙ্গে যোগাযোগ করা। একদিন সূর্য যখন মাঝ আকাশে ইলিয়া তখন তার চিন্তাধারার প্রথম প্রশ্নের নমুনা ডেন্ট্রয়ারের দিকে পাঠালো। ইঞ্জিন ঘরের অস্পষ্ট অগ্নিশিখার দিকে সোজাসুজি সে তাক করলো। তার মনে হল, বিদেশী বুদ্ধিমান লোকেরা ওখানেই থাকবে।

ইঞ্জিন এবং আগুনের ঘরের আশেপাশে যে চৌত্রিশ জন লোক পরপর মারা গেছে তাদের তীরেই কবর দেয়া হয়েছে। পরিত্যক্ত কলশন থেকে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় শক্তি বিকিরণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের জীবিত সঙ্গীরা সেখানেই থাকবে আশা করা যায়।

সপ্তম দিন পরিবহণ বিমানগুলি যখন বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও কর্মী নামাচ্ছিল তখন তিনজন লোক অসুস্থ হল। তাদের রক্তের শ্বেতকণিকা মারাত্মকভাবে কমে গেল। কোন নির্দেশ না আসা সত্ত্বেও মেনার্ড শংকিত হয়ে সমস্ত বিমান কর্মীদের পর্যবেক্ষণের জন্যে হাওয়াই পাঠানোর নির্দেশ দিল।

অফিসারদের ঠিক করতে বললো তারা যাবে না থাকবে। তবে সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার অফিসার, ফার্স্ট গানারি অফিসার এবং কয়েকজন নিম্নপদস্থ সেনা অফিসারকে কোন ঝুঁকি না নিয়ে প্রথম ক'টি বিমানেই সিট দখল করত নির্দেশ দিল। সবাইকেই চলে যেতে বলা হলেও, কয়েকজন বৈমানিক থেকে যাবার অনুমতি চাইল। গার্সনের সতর্ক জেরার পর কয়েকজনকে শেষ পর্যন্ত থাকবার অনুমতি দেয়া হল। তাদের প্রমাণ দিতে হল যে তারা আক্রান্ত এলাকার কাছে ছিল না। মেনার্ড চেয়েছিল, গার্সন যাতে চলে যায়। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল। বিপর্যয়ের সময় ডেস্ট্রয়ারের ওপরে যে সব অফিসার ছিল তাদের মধ্যে লেফটেনাণ্ট গার্সন, লউশন এবং হার্ভার। শেষের দুজন গানারি অফিসার আর নিম্নপদস্থ অফিসার ম্যাকপেলটি, রবার্টস এবং রবার্টস দ্বীপের তীরে ছিল। উচ্চ-পদস্থদের মধ্যে আর যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে ছিল চীফ কমিশারি স্টুয়ার্ড, জেনকিনস এবং প্রধান মাঝি ইউওয়েল।

নৌবাহিনীকেও শিবির গুটিয়ে চলে যাবার জন্য কয়েকবার বলা হল। শেষপর্যন্ত মেনার্ড যখন দেখল আবার ভীড় বাড়ছে তখন মেনার্ড বিরক্ত হয়ে শিবিরের তাঁবু গুটিয়ে উপকূলের দিকে চলে যাবার নির্দেশ দিল।

কয়েক সপ্তাহ চলে গেল। তবু কমাণ্ড গুটিয়ে ফেলার কোন নির্দেশ এল না। স্বভাবতই ঘাবড়ে গেল মেনার্ড। রাগও হল খুব। বিজ্ঞানী, বুলডোজার এবং সিমেণ্ট মিকশ্চারের সঙ্গে দ্বীপটিতে কিছু খবরের কাগজও এসেছে। একটি কাগজে ভেতরের কলমে এমন একটা সংবাদ দেখেছিল যা থেকে সে প্রথম ব্যাপারটার একটা ইঙ্গিত পায়। তাতে একজন কল্যামিস্ট জানিয়েছেন, এই তদন্ত অভিযান চালাবার ব্যাপারে কর্তৃত্ব নিয়ে আণবিক শক্তি কমিশনের অসামরিক সদস্য এবং নৌবাহিনীর হোমরাচোমরাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। ফলে নৌবাহিনীকে এই জায়গা থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

খবরটা পড়ে মেনার্ডের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল। বুঝতে পারল দ্বীপটিতে সে নৌবাহিনীর একমাত্র প্রতিনিধি। এ চিন্তাটাও মাথায় গেঁথে গেল যে পরিস্থিতিটা যদি ঠিকমত মোকাবিলা করতে পারে তাহলে অ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হওয়া মোটেই অসম্ভব হবে না। মনে মনে সেই সৌভাগ্যের একটা ছবি এঁকে রোমাঞ্চিত হল মেনার্ড। প্রতিটি ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা ছাড়া আর ঠিক কি করা উচিত হবে তা ভেবে পেল না সে। এ যেন এক বিশেষ ধরনের আত্ম-নিগ্রহ।

মেনার্ড ঘুমোতে পারল না। বিজ্ঞানী এবং তাদের সহকারীদের বিশাল শিবির সমাবেশের ভেতর দিয়ে যতটা নির্দোষভাবে সম্ভব ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটাতে লাগল। রাত্রিবেলা কয়েকটা গোপন জায়গা থেকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত তীরভূমির দিকে সে লক্ষ্য রাখত। প্রশান্ত মহাসাগরের নিস্তব্ধ রাতের বিশাল অন্ধকার মরুপ্রান্তরে সে যেন এক আলোর বিস্তৃত মরূদ্যান। জলের চাপা কলধ্বনির মাঝে এক মাইল জুড়ে সুতোয় গাঁথা আলোর মালা। সেই আলোয় পর্বতের প্রান্ত থেকে শুরু করে গড়ে তোলা দীর্ঘ চওড়া সিমেন্টের দেয়াল-গুলো কালোয় ফুটে ওঠা ছায়ার নকশার মতো লাগত। শিলাখণ্ডের চারপাশে নিরাপত্তার জন্য দেয়াল উঁচু করে এরই মধ্যে গাঁথা হয়েছে, যাতে বাইরের সঙ্গে এর কোন সংস্পর্শ না থাকে। মাঝরাতে সব সময়েই দেখা যেত বুলডোজারের তীব্র গর্জন বন্ধ হয়েছে, সিমেণ্ট-মিকশ্চারের ট্রাকগুলো তাদের শেষ মালপত্র নামিয়ে দিয়ে দ্রুত সমুদ্রতীরের অস্থায়ী রাস্তার নিস্তব্ধতায় অদৃশ্য হয়েছে। এক অস্বস্তিকর তন্দ্রায় দৈত্যপুরীর মত এই সংস্থার পুরো উপনিবেশটি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, অত্যন্ত কষ্ট করে অসীম ধৈর্য নিয়ে মেনার্ড সাধারণত অপেক্ষা করত, প্রায় একটার সময় সেও শুতে যেত। গোপন অভিযানে কাজ হল। শিলাখণ্ডটি কীভাবে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে একমাত্র সে-ই তা দেখতে পেল। ঘটনাটা দারুণ বিস্ময়কর, তখন রাত প্রায় পৌনে একটা বাজে। হঠাৎ এক শব্দ শুনে সচকিত হল মেনার্ড। যেন একটা ট্রাক নুড়িপাথর ঢালছে ট্রাক থেকে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটাকে তার এই গোপন জায়গার সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে ভাবল। তার এই নৈশ গোয়েন্দাগিরির কাজকর্ম ধরা পড়ে যাবে এই আশঙ্কা দেখা দিল।

শিলাখণ্ডের সেই দুর্বার গতির সামনে পড়ে সিমেণ্টের দেয়াল খসে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হল। দৈত্যের মত শিলাটির পঞ্চাশ, ষাট এবং তারপর নব্বুই ফুট অংশ পাহাড়ে উঠেছে বলে মনে হল। তারপর প্রবল শক্তিতে কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে সেটা থামল।

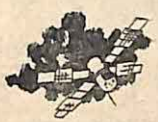
দুমাস ধরে ইলিয়া লক্ষ্য করেছে মালবাহী জাহাজ এই চ্যানেল ধরে যাচ্ছে। এই পথটা দিয়ে তারা কেন যায় তা জানবার জন্য তার আগ্রহ হল। অবাক হত ভেবে যে এই জাহাজগুলোর চলাচলে এমন কী বাধা আছে যাতে তারা ঠিক একই সমান্তরালরেখায় যাতায়াত করে থাকে। আরো যা আশ্চর্যের তা হল এই যে বিদেশী জাহাজগুলো দ্বীপটির চারপাশে গোপনে চলাচল করে এবং দ্বীপের পূর্ব উপকূলের কাছে একটা উঁচু শৈল অন্তরীপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় চলে যাবার কয়েকদিন পরে তাদের আবার দেখা যায় চ্যানেলে ঘুরে বেড়াতে এবং ক্রমশ দিগন্তের আকাশপ্রান্তে মিলিয়ে যেতে। সেই কটি মাসে ইলিয়া ছোট ছোট সুন্দর অথচ দ্রুতগামী ডানাওয়ালা জাহাজ

দেখতে পেত যেগুলো অনেক উঁচু থেকে এসে পূর্বদিকের পাহাড়চূড়ার পেছনে মিলিয়ে যেত। সবসময়েই সেগুলো পূর্বগামী ছিল। তার খুব কৌতূহল হত। কিন্তু অযথা শক্তিক্ষয়ের পক্ষপাতী ছিল না সে। রাত্রিবেলা পূব আকাশে একসারি অস্পষ্ট উজ্জ্বল আলোর শিখা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল। সে তার নিম্নতর পৃষ্ঠতলে প্রবলতর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নির্দেশক গতিসঞ্চার সম্ভব করে তুলেছিল, এবং শেষের প্রায় ৭০ ফুট পর্যন্ত উঠে পর্বতের শিখরে চড়েছিল।

একটা জাহাজ উপকূলে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের পূর্ব ঢাল ধরে অস্পষ্ট আলোকশিখাগুলোর কোন উৎস নেই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চারপাশে বেশ কিছু ট্রাক ও বুলডোজার দ্রুত চলে যেতে দেখা গেল। কয়েকটি তার খুব কাছাকাছি সংস্পর্শে এসেছিল। সে বুঝতে পারল না সেগুলো কী চায়, আর কীই বা তারা করছে। বিভিন্ন বস্তুর দিকে যে কয়েকটা প্রশ্নের তরঙ্গ পাঠিয়েছিল কিন্তু কোন উত্তরই পায়নি।

সুতরাং অকাজ বলে সে এটা ছেড়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালে শিলাখণ্ডটি তখনো পাহাড়ের চূড়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল ফলে দ্বীপের উভয় দিকে মাঝে মাঝে হঠাৎ শক্তির বিস্ফোরণ হচ্ছিল। মেনার্ড চীফ কমিশনারী ষ্টুয়ার্ড জেনকিন্সের কাছ থেকে ক্ষতির প্রাথমিক বিবরণ শুনল। সাতজন ট্রাক ড্রাইভার এবং দুজন বুলডোজারের চালক নিহত। এক ডজন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টিতে সেঁকা লেগেছে। দু মাসের পরিশ্রম নষ্ট।



বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিশ্চয় একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। কেননা দুপুরের কিছু পরেই সরঞ্জাম বোঝাই ট্রাক ও বুলডোজার নৌবাহিনীর শিবিরের পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল। তাদের পেছনে অনুসরণকারী একজন নাবিক জানাল, নিম্নতর প্রান্তে তারা এক জায়গায় শিবির স্থাপন করছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। প্রোজেক্টের ডিরেক্টর চারজন কার্যনির্বাহী বৈজ্ঞানিকসহ আলোকিত এলাকায় এসে মেনার্ডের খোঁজ করলেন। বিজ্ঞানীদলের সকলেই বন্ধুর মত ব্যবহার করলেন। মুখে তাদের হাসি। করমর্দন করলেন সবাই মেনার্ডের সঙ্গে। মেনার্ড তাঁদের গার্সনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। গার্সন অবশ্য তখন সেখানে ছিল না, ছিল শিবিরে। এবার আসল কথায় এলেন তাঁরা।

ডিরেক্টর বললেন, "আপনি তো জানেনই, কলশন কেবল আংশিকভাবে তেজস্ক্রিয়

রয়েছে। পেছনে রাখা চূড়ার কামানের ক্ষতি হয় নি। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। ঐ পাথরের ওপর গোলাবর্ষণ করুন যাতে ওটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে মেনার্ডের একমুহূর্ত সময় লাগল। সে বুঝতে পারল না, এর কী জবাব দেবে, পরের ক'দিনও সে বৈজ্ঞানিকদের এই অদ্ভুত মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলল না কোন। সে বরং তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। তৃতীয় দিন সে যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাল, "আপনারা যে সতর্কতা অবলম্বন করছেন তা যথেষ্ট নয়। পাথরটায় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে ভেবে শিবির ভেঙে ঐদিকটায় নিয়ে যাওয়াটা যথেষ্ট রক্ষাকবচ বলে আমি মনে করি না। এখন অবশ্য আমি যদি নৌ-বাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করার কোন নির্দেশ পাই…"

মেনার্ড কথাটা শেষ করল না। তাঁদের হতাশ মুখ দেখে অনুমান করল, নিজেদের সদর দপ্তরের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিকদলের নিশ্চয় খুব উত্তেজনাকর বার্তা বিনিময় হয়েছে। চতুর্থ দিন কোয়াজালিন খবরের কাগজটি আসতেই তাতে দেখা গেল, ওয়াশিংটনে একজন উচ্চপদস্থ নৌবাহিনীর উক্তি উদ্ধৃত করে তাতে বলা হয়েছে, "দ্বীপে অবস্থানরত নৌ-কমাণ্ডারের বিচারবুদ্ধির ওপর এধরনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দিতে হবে।" একথাও লেখা হয়েছে, যদি যথাযথ প্রণালীতে অনুরোধ জানানো হয় তাহলে নৌবাহিনী নিজে থেকে অকুস্থলে একজন আণবিক বিশেষজ্ঞ পাঠাবে।

মেনার্ড বুঝতে পারল, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবেই সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। কিন্তু এই রিপোর্ট পড়া শেষ হতেই সে শুনতে পেল ডেস্ট্রয়ারের পাঁচ ইঞ্চি কামানের গোলার তীক্ষ্ম শব্দ দ্বীপের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খানখান করে দিল।

টলমল পায়ে মেনার্ড উঠে দাঁড়াল। নিকটতম শিখরের দিকে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সে দ্বিতীয়বার গোলার আওয়াজ শুনতে পেল লেগুনের অন্য দিক থেকে। আবার শোনা গেল শিলাখণ্ডের কাছাকাছি জায়গা থেকে প্রতিধ্বনিত কান ফাটা বিস্ফোরণ। তার সুবিধাজনক স্থানটিতে গিয়ে মেনার্ড চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখল, প্রায় এক ডজন লোক জাহাজের পেছনের ডেকে কামানের চূড়ার আশেপাশে ছুটোছুটি করছে। আর এক নতুন উপসর্গ হিসেবে ক্যাম্পের ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। ডিরেক্টর ঠিক করেছেন, ডেস্ট্রয়ারে সাহায্যকারী প্রতিটি লোককে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক অনধিকার প্রবেশের জন্য গ্রেপ্তার করা হবে।

মেনার্ডের মনে হল, নিজেদের মধ্যে ভেতরকার কলহের দরুন সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের এই যে আজ প্রকাশ্য বিরোধিতা দেখা দিয়েছে এটা সত্যি এক

দুঃখজনক ব্যাপার। ক্ষমতার লড়াই ছাড়া আর তেমন কিছুই যেন জড়িত নয় ব্যাপারটিতে। প্রশ্নটা চকিতে একবার মনে এসেই আবার হারিয়ে গেল।

তৃতীয়বার গোলাবর্ষণের জন্য মেনার্ড অপেক্ষা করল। তারপর দ্রুত পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে শিবিরের দিকে পা. বাড়াল। অফিসার ও নাবিকদের দ্রুত নির্দেশ দিতেই তাদের মধ্যে আটজন দ্বীপের উপকূলভাগ বরাবর স্থান নিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে তারা উপকূলে অবতরণ প্রয়াসী বাকীদের নিয়ে মেনার্ড নৌবাহিনীর নিকটতম নৌকার দিকে এগোল। সেখানে যেতে পথটা একটু দীর্ঘই বলা যায়। উপকূলের ঐ স্থানটি এবং জাহাজের মধ্যে বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কেননা দ্বীপের দূর প্রান্তে একটি মোটর-বোট দেখা দিতেই মেনার্ড বর্তমানে পরিত্যক্ত ও নীরব কলশনের দিকে এগোল।

একবার দ্বিধাগ্রস্ত হল মেনার্ড। সে কি মোটর বোটটিকে তাড়া করবে? শিলা-খণ্ডটির সযত্ন পরীক্ষা থেকে বোঝা গেছে পাথরটি আপাতদৃষ্টিতে অভগ্নই রয়েছে। এই ব্যর্থতা যেমন তাকে উৎফুল্ল করল, তেমনি সাধারণও কেননা এ থেকে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না যে ডেন্ট্রয়ারটিতে আরোহণ নিবারণে সে প্রয়োজনীয় সাবধানতা গ্রহণ করে নি।

সমস্যাটার কথা মেনার্ড তখনো ভাবছিল। এমন সময় ইলিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা ডেন্ট্রয়ারের দিকে গড়িয়ে চলল।

ডেন্টয়ারেরর কামান থেকে নিক্ষিপ্ত প্রথম উজ্জ্বল গোলাটি ইলিয়া দেখতে পেল। তারপর মুহূর্তেই লক্ষ্য করল একটা বালকের মত জিনিস তার দিকে আসছে। পুরোনো কালে এমনি নিক্ষিপ্ত বস্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। এখানো তাই সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটির অপঘাতের জন্য উত্তেজনায় টান টান হল। বস্তুটি তাকে কঠিনভাবে আঘাত করার বদলে ফেটে গেল। পরিণতি হল বিস্ময়কর। তার প্রতিরক্ষামূলক আবরণটিতে ফাটল দেখা দিল। প্রচণ্ড আঘাতে সব একাকার হয়ে গেল। তার বিরাট দেহপিণ্ডের প্রতিটি ইলেকট্রনিক প্লেটের স্রোতপ্রবাহ বিকৃত হল।

সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ক্রিয় স্থিতিস্থাপক 'টিউব' থেকে সমতা বিধায়ক স্পন্দন পাঠানো হল। শিলাখণ্ডের ভেতরের আধা-শক্ত, আধা-তরল পদার্থ উষ্ণতর হয়ে উঠল, তার তরলতা বাড়ল। প্রচণ্ড আঘাতে যে দুর্বলতা দেখা দিল তার ফলে প্রচণ্ড চাপে কঠিনীভূত তরল পদার্থের সঙ্গে স্বাভাবিক সংযোগ ঘটল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে ইলিয়া ভাবতে লাগল এটা কি হল? এটা কি যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস?

এই সম্ভাবনা তাকে উত্তেজিত করে তুলল। বাইরের দেয়ালের ফাঁক বন্ধ না করে সে তার ঠিক পেছনের পদার্থটি শক্ত করল। অপেক্ষা করল। আবার সেই নিক্ষিপ্ত বস্তু এবং তার ওপর প্রচণ্ড আঘাত।

এরকম এক ডজন আঘাতের পর আঘাত এল। প্রতিটি আঘাতই তার আত্মরক্ষা-মূলক আবরণে প্রচণ্ড বিপর্যয় সৃষ্টি করল। সংশয় দেখা দিল ইয়িলার মধ্যে। এগুলি যদি বার্তা হয়ে থাকে তবে তা সে গ্রহণ করতে বা বুঝতে পারে নি। যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তার আত্মরক্ষামূলক দেয়ালটি বন্ধ করে রেখেছে সে তাকে অনিচ্ছাকৃতভাবেই কাজ করতে দিল। গর্তগুলি বন্ধ করার আগেই নিক্ষিপ্ত বস্তু তার প্রতিরক্ষা-প্রাচীর ভেঙ্গে দিল।
তবু তার ওপর আক্রমণ হিসেবে যা ঘটে গেল তা সে ভাবে নি। তার এতদিনের অস্তিত্বে আর কখনো তাকে এরূপ আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় নি। ইলিয়ার এখন মনে পড়ছে তার বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। তবে নিশ্চয়তা এতটা অবিমিশ্র আণবিক শক্তিসম্পন্ন নয়।
খুব অনিচ্ছাকৃতভাবেই ইলিয়াকে স্বীকার করতে হল, এটা আক্রমণই ছিল। অবশ্য তার জন্য তার রাগ হল না। প্রতিরক্ষার অভিব্যক্তিটি তার মধ্যে যুক্তি-সম্মতভাবেই ঘটেছিল, আবেগঘটিতভাবে নয়। ডেস্ট্রয়ারটিকে সে পরীক্ষা করেছিল। তার মনে হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য হবে এটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। এমন ধরনের প্রতিটি জীবই তার কাছে এলে তার তাড়িয়ে দেবার প্রয়োজন হবে। যেসব বস্তু তার দিকে ছোঁড়া হয়েছিল সে তা পাহাড় চূড়ায় আরোহণের সময় দেখেছে। এ সবই এখান থেকে হটিয়ে দিতে হবে।



পাহাড় দিয়ে সে নামল। অধিত্যকার ওপরে যে জীবটি ভাসছে তার শরীর থেকে আর আগুন বেরুচ্ছে না। ইলিয়া যখন এর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল, তখন তার পাশে জীবনের শুধু চিহ্ন হিসেবে একটি ক্ষুদ্রতর বস্তু।
একসময় ইলিয়া জলের ভেতরে গেল। সে ভুলে গিয়েছিল এই জনশূন্য উষর পাহাড়ে এমন একটি স্তর আছে যার নীচে জীবনবেগ ব্যাহত হয়। প্রথমে দ্বিধা হল। পরে ধীরে ধীরে সে আরো নীচে নেমে গাড়িয়ে পড়ল। সে জানত এমন এক পর্যায়ের শক্তি সে অর্জন করেছে যাতে এমনি অবিমিশ্র ঋণাত্মক চাপের বিরুদ্ধে সে টিকে থাকতে পারবে।
ডেস্ট্রয়ার থেকে তার দিকে গোলা নিক্ষেপ হতে লাগল। গোলাগুলো খুব কাছে থেকে ছোঁড়া হয়েছে। যে ৯০ ফুট পর্বতপৃষ্ঠের সঙ্গে ইলিয়া শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে তার গায়ে গোলা লেগে বড় বড় গভীর গর্ত তৈরী হল। শিলাখণ্ডের

দেয়াল ডেন্ট্রয়ার স্পর্শ করা মাত্র গোলাবর্ষণ বন্ধ হল। মেনার্ড এবং তার লোকজন যতক্ষণ সম্ভব কলশন রক্ষা করার পর একপাশে রাখা তাদের নৌকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং দ্রুত নৌকা বেয়ে দূরে চলে গেল।
ইলিয়া একটা ধাক্কা দিল। বড় বড় গোলার আঘাতে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মতই সে তীব্র বেদনা অনুভব করল। অনেক কষ্টে তার শরীরটা নিজেই নিজে সারিয়ে তুলল। ক্রোধে ঘৃণায় এবং ভয়ে তার শরীর কেঁপে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই বৃহৎ ও অদ্ভুতদর্শন শিলাখণ্ডের মধ্যে সে জট পাকিয়ে ফেলল।

এরপর এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। পাথরের মধ্যে জীবটি ভয়ে কাঁপতে লাগল। যেন তার ভেতরেই কোন ধ্বংসাত্মক শক্তি তাকে কাবু করে ফেলেছে। একসময় সে এক আহত জন্তুর মত কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে ভেতরে জুড়িয়ে যেতে এক পাশে পড়ে গেলো।
অদ্ভুত বিস্ময়কর সেই দৃশ্যটি। জল থেকে উঠে ইলিয়া আবার পাহাড়ে চলল এবং পাহাড়ের অন্য প্রান্তে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেখানে তখন একটি পণ্যবাহী জাহাজ সবে যাত্রা শুরু করেছে। সমুদ্রের ওপরে অন্তরীপটির চারপাশে ঘুরে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে অদূরের জনহীন নিষ্পাদক উপত্যকা পেরিয়ে গেল। বেশ কয়েক মাইল চলার পর তার গতি মন্থর হল। সে থামল।
ইলিয়া আরো অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার গতি ভূ-চলাচলের মধ্যে সীমিত থাকায় পণ্যবাহী জাহাজটি থামার সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এসে সেইদিকে ভেসে চলল যেখানে ছোট ছোট কিছু বস্তু ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল। সে দেখতে পায় নি যে তীরের কাছে জলমগ্ন চড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকগুলো কিছুটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদের সাজসরঞ্জামের ধ্বংসকাণ্ড দেখছিল। ইলিয়া তার পেছনে কয়েকটি জ্বলন্ত ও দোমড়ানো মোচড়ানো যান রেখে গেছে।
কয়েকজন ড্রাইভার তাদের মেশিনপত্র সরাতে গিয়ে সেই মেশিনের ভেতরেই রক্তমাংসের ডেলায় পরিণত হয়েছিল। চারদিকে তখন এক দারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘণ্টায় আটমাইল বেগে ইলিয়া তখন ভেসে চলেছে। তিনশ সতের জন লোক ফাঁদে আটকে পিষে ফেলতে চাইছে এক দানব। অথচ দানবটি তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পায় নি। প্রতিটি লোকই ভাবছিল তাকেই তাড়া করছে সেই ভয়দানব।
কিছুক্ষণ পরে ইলিয়া নিকটতম পাহাড় চূড়ায় উঠে আকাশটার দিকে তাকালো। দেখল আরো কোন অনুপ্রবেশকারী কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা, না, কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। কেবল সেই পণ্যবাহী জাহাজটা। চার মাইল দূরে অন্ধকার ছায়ার মতো সে দাঁড়িয়ে আছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘিরে ধরল দ্বীপটিকে। মেনার্ড খুব সাবধানে ঘাসের ওপর দিয়ে উপত্যকার ঢালুতে নেমে চলল। তার হাতে ফ্লাশলাইটের আলো সরাসরি সামনে ফেলে চলছিল। কিছুক্ষণ পরপরই সে বলে চলল, "আশেপাশে কেউ আছো কি?" কয়েক ঘণ্টা ধরে এ রকমই চলছিল। সন্ধ্যা নামতেই তারা জীবিতদের খুঁজে খুঁজে বের করে নৌকায় তুলছিল। তারপর নৌকায় করে চ্যানেল পেরিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছিল দাঁড়িয়ে থাকা পণ্যবাহী জাহাজটিতে। বেতারে নির্দেশ আসছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। তারপর বিমান থেকে দ্বীপটিতে গোলাবর্ষণ করা হবে।

রাত নেমেছে এই দানব-অধ্যুষিত দ্বীপে। হেঁটে চলেছে মেনার্ড। ত্রাসে ভয়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনার আনন্দ অনুভব করছিল মেনার্ড। জাপানী-অধিকৃত একটি সমুদ্রোপকূলে জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণের সময় যে রকম অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। সেসময় সে কল্পনা করছিল জাহাজে নয়, সমুদ্রতীরেই সে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কামানের গোলা এসে পড়ছে তার ওপর। একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিতে লাগল মেনার্ড। যদি এমন হয় একমাত্র তাকে ফেলে পণ্যবাহী জাহাজটি চলে গেছে। যদি এমন হয়!



ভাবনার খেইটা হারিয়ে গেল অন্ধকারে এক চাপা গোঙানির শব্দে। ফ্লাশ-লাইটের আলোয় মেনার্ড কিছুটা পরিচিত একটি মুখ দেখতে পেল। একটা গাছে চাপা পড়ে গিয়ে লোকটি ভয়ানকভাবে আহত। গার্সন এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে মরফিন দিল। মেনার্ড লোকটির খুব কাছে এসে তাকে উদ্বেগের সঙ্গে দেখতে লাগল।

লোকটি আর কেউ নন, একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। বিপর্যয়ের পর বেতার বার্তায় তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছিল। তিনি মতামত না দেয়া পর্যন্ত পৃথিবীর কোন বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষেই নৌবাহিনীর বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনায় সম্মতি দেয়া সম্ভব ছিল না।

মেনার্ড সম্বিত ফিরে পেল যেন। জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনার কি মনে হয়…?" কথাটা শেষ করল না মেনার্ড। মুহূর্তের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল, নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই আণবিক বোমা বর্ষণের নির্দেশ দিয়েছে সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর।

বিজ্ঞানী নড়েচড়ে বসলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "মেনার্ড, জীবটা একটু অদ্ভুত ধরনের। এমন কিছু করতে দিও না যাতে…।" যন্ত্রণায় তাঁর চোখ দুটো

উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবসাদে ভেঙ্গে পড়ল তাঁর কণ্ঠ।
এখনি যা জিজ্ঞেস করবার করতে হবে। এরপরই তো উনি গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়বেন। তারপর থেকে সেভাবেই রাখতে হবে তাঁকে। আর দেরী করা চলবে না। মেনার্ড ভাবল।
এক মুহূর্ত চলে গেল। লেফটেনাণ্ট গার্সন উঠে দাঁড়াল। "ক্যাপ্টেন ওটা করতেই হবে।" স্ট্রেচার বয়ে এনেছিল কয়েকজন সিম্যান। এবার তাদের দিকে ফিরে গার্সন বলল, "এঁকে নৌকায় নিয়ে যাও। সাবধানে নিয়ে যেও। ওঁকে আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"
একটাও কথা না বলে মেনার্ড স্ট্রেচারের পেছনে পেছনে চলল। একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনের দায় থেকে সে রক্ষা পেয়েছে এরকম একটা অনুভূতি তার মধ্যে দেখা দিল। রাত বেড়ে চলল।
ভোর হয়েছে। সূর্য ওঠার একটু পরেই এক পশলা বৃষ্টি দ্বীপে বর্ষণের পর পূব দিকে ছুটে গেল। আকাশটা আশ্চর্য নীল হয়ে উঠল। সমুদ্র শান্ত। চার দিকের জলরাশি নিস্পন্দ।
নীল স্তব্ধ সাগরের বুকে দ্রুত চলমান ছায়া ছড়িয়ে দিগন্ত থেকে উড়ে এল একটি বিমান। দেখা দেবার আগেই ইলিয়া এর ভারী বোঝাটা টের পেল। তার দেহপিণ্ড কেঁপে উঠল। প্রকাণ্ড ইলেকট্রন টিউবগুলি ভবিষ্যৎ অঘটনের সম্ভাবনায় বাড়তে-কমতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত ইলিয়ার মনে হল, তারই মত কোন প্রাণী এগিয়ে আসছে।
বিমানটি আরো কাছে আসতেই ইলিয়া তার চিন্তাতরঙ্গ সেদিকে চালিত করল। এর আগে এই চিন্তাতরঙ্গ প্রয়োগ করার পর বেশ কয়েকটি বিমান আকাশপথে দুমড়ে মুচড়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে পড়ে গেছে। কিন্তু এই বিমানটি তার যাত্রাপথ থেকে একটুও নড়ল না। ঠিক প্রায় মাথার ওপর এলে বিমানটি থেকে একটা বড় কিছু জিনিস ফেলে দেয়া হল। জিনিসটা আস্তে আস্তে ইলিয়ার দিকে এগোচ্ছিল। লক্ষ্যবস্তুর প্রায় একশ ফুট ওপরে এটির বিস্ফোরণ হবার কথা ছিল।
নিখুঁত সময়সীমার মধ্যে বিশাল এক বিস্ফোরণ ঘটল।
এই নতুন শক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাব কেটে যেতেই পরিপূর্ণ প্রাণবান ইলিয়া শান্ত হয়ে ভাবতে লাগল, "কেন, এটাই তো আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলাম। এটাই তো আমার করার কথা ছিল।"
ভুলে গেছে একথা ভাবতেই সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। আন্তঃনক্ষত্রীয় একটি যুদ্ধে তাকে পাঠানো হয়েছিল—আপাতদৃষ্টিতে এখনো যা চলছে। প্রচণ্ড দুঃসাধ্য প্রয়াসের মাধ্যমে তাকে এই গ্রহে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। শত্রুপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। এখন সে তার ওপর

দেয়া দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত।
ইলিয়া তার রাডার সিগন্যালের আওতায় রয়েছে এমন সব গ্রহ ও সূর্যের ওপর পরীক্ষামূলক দৃষ্টি সঞ্চালন করল। তারপর আরম্ভ করল এমন একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া যাতে তার শরীরের ভেতরের সব আবরণ গলে যায়। চূড়ান্ত ধাক্কা দেবার জন্য সে তার সমস্ত চাপশক্তি সংহত করল। এর ফলে ঠিক নির্ধারিত মুহূর্তে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদার্থগুলি একত্রিত হবে।
যে দারুণ বিস্ফোরণ একটি গ্রহকে তার কক্ষচ্যুত করেছিল তা পৃথিবীর সমস্ত ভূকম্পন যন্ত্রে ধরা পড়ল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিছুকাল পরে আবিষ্কার করবেন পৃথিবীটা সূর্যের দিকে সরে যাচ্ছে। সৌর অগ্নিশিখার নোভা উজ্জ্বলতা দেখতে কোন মানুষই বেঁচে থাকবে না। দেখবে না সৌরশক্তি পুড়ে ছাই হয়ে ক্রমশ কীভাবে অনুজ্জ্বল 'জি' ষ্টেটে পরিণত হবে।
ইলিয়া যদি জানতও যে দশ হাজার মিলিয়ন শতাব্দী আগে যে যুদ্ধ হয়েছে এটা সে যুদ্ধ নয়, তাহলেও সে যা করেছে তা না করে উপায় থাকত না।
রবোট অ্যাটম বোমা নিজেদের মনস্থির করে না।

ভাষান্তর ঃ **বীরেন সাহা**

ভইচু বুগারিউ

আগে নাম ছিল রুমানিয়া এখন রোমানিয়া। বাল্টিক সাগরের পারের দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। হিটলারের কুক্ষিগত হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের সময়, তখন অনেক অত্যাচার অনেক কষ্টের দিন গেছে এই রাজ্যটির ওপর দিয়ে। সে সব এখন স্মৃতি। রুমানিয়া নিজেকে গড়ে তুলেছে ফুলে, ফলে শস্যে, উৎপাদনে। মনুষ সেখানে স্বস্তিতে দিনযাপন করে। সর্বত্র বিজ্ঞানের আশীর্বাদ।

সুতরাং গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে বিজ্ঞানের পদপাত খুবই স্বভাবিক। কল্পবিজ্ঞানের গল্পও লেখা হয় সেখানে। আমাদের দেশে আজ অবধি সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার কোনো কল্পবিজ্ঞানের গল্প অনুদিত হয় নি। এই প্রথম।

'কণ্ঠস্বর' গল্পের লেখক ভয়চু বুগারিউ জন্মগ্রহণ করেন ৬ই জুলাই ১৯৩৯ সনে। দর্শনে স্নাতক। রোগা, লম্বা, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। চোখে চৌকো চশমা। মুখ সব সময় হাসি-হাসি। রঙচঙে জামা পরতে ভালবাসেন। রাজধানী বুখারেস্টের একটি পত্রিকার সম্পাদক। সাহিত্যের ওপর অসীম ঝোঁক। সাহিত্য নিয়েই তাঁর জীবন। কবিতা লিখতে ভালবাসেন এবং স্বদেশে খ্যাতিমান কবি। তার প্রকাশিত কবিতার বইয়ের নাম 'দ্যা হোমল্যাণ্ড এণ্ড দ্যা পোয়েটিক্যাল ওয়ার্ড'। প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সনে। সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক বই লিখে নিজের দেশের বুদ্ধিজীবীদের চমৎকৃত করেছেন, বইটির নাম 'এসেজ অন লিটারারি থিয়োরি এণ্ড হিস্ট্রি'। এই মানুষটির বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে। তিনি অবসর সময়ে লেখেন এই গল্প। ইতিমধ্যে কম লেখেন নি। দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে চার বছরের মধ্যে। 'ভাইকিংস্ ভয়েস' (১৯৭০) ও 'দ্যা স্ফিয়ার' (১৯৭৩)। বুগারিউর গল্পের বৈশিষ্ট্য হল, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা, যেখানে থাকে হৃদয়ের স্পর্শ।



দি ভয়েস্

তোমাকে একটি আরামকেদারায় বসিয়ে একটি ঘরে নিয়ে আসা হল। ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই ওই আরামকেদারাটি ছাড়া। তোমাকে বলা হল চুপচাপ বসতে। যে লোকটা তোমায় এখানে নিয়ে এল, সে ছায়ায় মিলিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তুমি এখন সম্পূর্ণ একা। তুমি যে দেয়ালটার মুখোমুখি বসেছ, সেটা আংশিক ধাতব, তাতে রয়েছে বোতাম আর আলোর ঝলক। এটা এক ধরনের যন্ত্র এবং জানান দিতে শুরু করল, চালু হয়েছে। একটা ঠাণ্ডা আলো ঘুরে গেল, সেই আলোর সরু রশ্মি তোমার শরীর এবং মুখের ওপর বুলিয়ে দিয়ে গেল। তারপর নিভে গেল। একট মৃদু গুঞ্জন শুরু হল এবং একটা ধাতব কণ্ঠ ফিসফিস করে তোমার নাম উচ্চারণ করল। করেই শব্দটা মিলিয়ে গেল তীব্র একটা শিস দিয়ে। তুমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলে। দরজার দিকে এগিয়ে গেলে কান্না চাপতে তারপর বেরিয়ে বারান্দা ধরে দৌড়তে শুরু করলে। বেরুবার মুখটায় এসে পড়লে। রাস্তার সংযত ভীড় চমৎকার। তুমি সেই যন্ত্রটার ফিসফিসানি অনুভব করলে, এবার যেন মনে হল গোঙানি, স্পর্শকাতর। তুমি ডাক্তারের ঘরের ভেতর দিয়ে একটু ইতস্ততভাবে সেই ঘরেই ফিরে এলে যেখান থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলে। ফিরে এসে সেই আরামকেদারায় গিয়ে বসলে। আলোর রশ্মি একবার তোমার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। যন্ত্র তোমাকে আবার খুব নরম সুরে ডাকল। আবার তুমি

ভয় পেলে। এবার সামান্য কর্কশ হল যন্ত্রের কণ্ঠ, তোমার নাম ধরে ডাকল। তারপর শব্দটা আর প্রায় শোনাই গেল না। মনে হল শব্দটা অনেক দূর থেকে আসছে। এমন সময় তোমার মনে হল অতি পরিচিত কিছু একটা যেন আশে-পাশে রয়েছে। তুমি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালে। বিবর্ণ দেয়াল ছাড়া, আর কিছুই তোমার চোখে পড়ল না।

একটু থেমে সেই শব্দটা আবার তোমায় ডাকল। শব্দটা এখন অনেক শব্দের মিশ্রণ, কারো একার নয়। তবু শব্দটা শুনে তোমার অর্থহীন একটা যন্ত্রণা হল। তুমি উঠে দাঁড়ালে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে, ঠাণ্ডা ধাতুতে গিয়ে হাত রাখলে, কেঁপে উঠলে।

যন্ত্রটা এখন নিঃশব্দ। তুমি সামান্য কাঁপতে কাঁপতে আরামকেদারায় ফিরে এলে। দিগভ্রান্ত হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। তুমি তখন ভাবছ এটা হয়ত তোমার স্বামীর রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের ত্রুটি কিছু। যাইহোক, কেন অনর্থক ব্যাপার সব ঘটছে ? অন্য কোনো শব্দ কি নেই ?



তুমি জানতে দু মাস আগে তিনি তাঁর ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসছেন। ওরা তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি। ওরা জানিয়েছিল, তাঁর পক্ষে এখন উত্তেজনা ক্ষতিকর হতে পারে। নিশ্চিত বলেছিল উনি বেঁচে আছেন। যারা এসব কথা বলেছিল, তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলে ওরা উচ্ছলতা দিয়ে সহানুভূতিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। পরে তুমি নিজেকে নিজেই বোঝাবার চেষ্টা করছিলে, সবই তোমার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, আসলে তিনি ভালই আছেন এবং অবিলম্বে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। তোমার বুকে বল এল, ভাবলে সবই ঠিক আছে। জীবন তোমাকে শিখিয়েছিল, সুযোগের ব্যাপারে খুব বেশী নির্ভর করা উচিত নয়, সুযোগের অপেক্ষায় থাকলে আসলে প্রতারিত হওয়া ছাড়া গতি থাকে না, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে তুমি প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করছিলে।

এবার একটা হিসহিসে শব্দ। তুমি এই শব্দের দিকে আকৃষ্ট হলে। তুমি এখন অনেকটা শান্ত। বুঝতে পারছ এক ধরনের নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা তোমাকে গ্রাস করছে। যন্ত্র যখন আবার কথা বলে উঠল, তখন তুমি ঘুমে ভেঙে পড়ছ যেন। যন্ত্রের ব্যবহার হঠাৎ পালটে গেল, তোমার নাম ধরে ডাকল। শব্দের মধ্যে ধাতব অনুভূতির কিছুই নেই বললে চলে, যথাযথ এবং মনোরম, ভীষণ রকম

নৈর্ব্যক্তিক, অনেকটা রোবটের মত। তুমি সচকিত হলে। তোমরে অনীহা কেটে গেল, তোমার মধ্যে জেগে উঠল নিস্তরঙ্গ জিজ্ঞাসা, জানতে চাইলে ধাতব-শব্দের অন্তর্গত অর্থ। তোমাকে এবার বলা হল শান্ত হয়ে বসে শুনতে। তুমি তখন ফিসফিস করে জবাব দিলে, বললে, শুনতে তুমি রাজি। এই আত্ম-সমর্পণে কত নিশ্চিন্ততা দেখ! কত স্বস্তি। তোমার মধ্যে কোমল নারীত্ব জেগে উঠল, তোমার হৃদয় মেয়েদের নমনীয়তায় প্লুত। এবার যন্ত্র তোমাকে আবেগের সঙ্গে জানাল, সে এখন তোমার স্বামীর কথাই বলবে। তুমি যন্ত্রের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলে, সম্মোহিত। মনে হল ঘরটা খুব ধীরে ধীরে দুলছে, ক্রমে তোমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অনেক কষ্টে নিজেকে ঠিক রাখতে হচ্ছে, তাকাতে হচ্ছে। যন্ত্রের ঠাণ্ডা চোখ একটুক্ষণের জন্যে জ্বলে উঠল, তোমার দিকে তাকাল, মুখের ওপর পড়ে কি যেন খুঁজল। আলো খুবই মৃদু, এতে কিছু অসুবিধে হল না তোমার। তুমি আলোটার গোড়ায় চোখ রাখলে, দেখলে, কেমন সহজে এর রঙ বদল হচ্ছে। কখনো সবুজ, কখনো খয়েরি, তারপরই বেগুনি। হঠাৎ আলোটা নিভে গেল।



স্বাভাবিকভাবেই ভ্রমণের প্রথম বছরটা ছিল বিপদ-আপদহীন। ভ্রমণ শেষ ক'রে ফেরার সময় অকস্মাৎ তোমার স্বামী রোগের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পেলেন। ক্রমে তাঁর ওজন কমতে শুরু হল, শরীরের দৈর্ঘ্যও দেখল কমে যাচ্ছে।

ধাতব শব্দটায় হঠাৎ তোতলামো, যেন ইতস্তত করছে আর কিছু বলতে। অর্থহীন কিছু শব্দ বেরিয়ে এল এলোমেলো।

ভীষণ রাগ হল তোমার, নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না, চেঁচিয়ে যন্ত্রকে জিজ্ঞেস করলে তোমার স্বামী বেঁচে আছে কিনা। কান্নায় ভেঙে পড়লে। যন্ত্র চুপচাপ নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে। তুমি ওটার দিকে দৌড়ে গেলে, ইচ্ছেমত ঘুঁষি চালালে, হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তারপর, হঠাৎ, চিৎকার করে কাঁদলে। বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলে, ফিসফিস করে কথা বললে, অথচ বুঝতে পারলে না সবকিছুই বৃথা হয়ে যাচ্ছে, তোমার আপ্রাণ হৃদয়ভাঙা আকুতি শোনার জন্যে তুমি ছাড়া কেউই নেই। আবার সেই আকুতির আচ্ছন্নতায় যন্ত্রটার সামনে হাঁটু ভেঙে নতজানু হয়ে বসে যন্ত্রের শরীরে কপালটা রাখলে। ঠাণ্ডা ধাতব দেয়াল। তুমি কিছুতেই বুঝতে পারছ না, তোমার এই ছটফটানির অবস্থার সঙ্গে বিন্দুমাত্র খাপ খাচ্ছে না। তুমি আপাদমস্তক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে আছ,

তুমি তোমার মধ্যে নেই, তুমি এখন এমন একজন নারী, যাকে চেনা খুবই কঠিন, যেন নামগোত্রহীন, অথচ তোমার অজানা নয়, এরকম কান্নাকাটি, গলার স্বরভঙ্গ, সবকিছুর মূলে রয়েছে তোমার যন্ত্রটা। যন্ত্রণা তোমার নারীত্বকে ভেঙে দু টুকরো করে দিয়েছে, আর তুমি ঢলে পড়েছ যেদিকে যন্ত্রণা, সেই দিকে।



তুমি নতজানু হয়ে রয়েছ এখনো। যন্ত্রের ঝকঝকে চোখ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল, যন্ত্র তোমাকে জানাল, তোমার স্বামী এখনো বেঁচে রয়েছেন। তোমাকে আরামকেদারায় গিয়ে বসতে অনুরোধ করা হল। আবার গল্প বলা শুরু হল। হঠাৎ যন্ত্রের স্বরে ভীষণভাবে ওঠা-পড়া শুরু হল। মাঝে মাঝে যন্ত্রটা যেন চেঁচিয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছে যন্ত্রটার মধ্যে কোথাও কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে। অন্য সময় হলে তুমি হেসে উঠতে, আজ কিন্তু অন্য এক অনুভূতি টের পেলে নিজের মধ্যে। যন্ত্রের শব্দগুলোকে যেন অস্পষ্ট চেনা চেনা ঠেকছে। হঠাৎ একটা পুরোনো অনুভূতির কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে একবার তুমি বাঘের খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। খাঁচায় বাঘটা ঘুমোচ্ছিল। চারদিকে কেমন একটা জানোয়ার-জানোয়ার গন্ধ। তুমি খাঁচাটার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালে, তারপর খুব ইচ্ছে হল ঘুমন্ত বাঘটাকে একটু আদর করে দিতে। প্রায় খাঁচার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলে আর কি—এমন সময় কাছের একজন লোক দেখতে পেয়ে চট করে টেনে সরিয়ে আনল তোমায়। তোমাকে টেনে আনবার সময় লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছিল হয়ত সামান্য। তাতেই বাঘটার বোধহয় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, জেগে বিরাট একটা হাই তুলেছিল। তুমি অত্যন্ত দুঃখে সরে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল বিরাট একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই ঘটনা তোমার জীবনে গভীর দাগ রেখে গেল, প্রায়ই তুমি বলতে তোমার জীবনের ধারাই পালটে যেত যদি তুমি বাঘটার খাঁচার ভেতরে হাত দিতে পারতে। ক'মুহূর্তের এই ঘটনাটি তোমার স্মৃতিতে গেড়ে বসেছিল। এ থেকে তোমার একটা অনুভূতি ভেতরে দানা বেঁধেছিল যার মূলে ছিল ভয় আর প্রত্যাশা। এখনো এই মুহূর্তে তোমার সামনে যা ঘটছে তা তোমাকে সেই আগেকার ঘটনার মতই উত্তেজিত করে তুলেছে। তোমার মধ্যে একটা দ্বৈত মনোবাসনার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। একবার চাইছ আঘাত করে মেশিনটাকে ভেঙে দিতে, আবার ইচ্ছে হচ্ছে আদর করে পিঠ চাপড়ে দিতে।
যন্ত্র বলে চলল, তোমার স্বামীর কোনো যন্ত্রণা ছিল না, তাহলেও তাঁর দেহের

ওজন ক্রমেই কমে আসছিল, ধৈর্য'ও সেইসঙ্গে। পরিচর্যা ছিল ত্রুটিহীন কিন্তু সবই হয়েছিল প'ডশ্রম। তার পরিধানের জামাকাপড় হচ্ছিল ঢিলে, কণ্ঠ হচ্ছিল ক্ষীণ। এই অবস্থা দেখে কারো কারো মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, তিনি যেন শৈশবাস্থায় ফিরে যাচ্ছেন। তবে মস্তিষ্কের কাজ যথাযথই ছিল, কিন্তু করোটির চামড়া হয়ে পড়েছিল দিনের পর দিন পাতলা। মুখের চেহারা ঝাপসা মত। পরিণত বুদ্ধি নিয়ে তিনি যেন শৈশবে ফিরে যাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর দিক থেকে একেবারেই অবাস্তব মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাঁর ফিরে আসার কিছুদিন আগে থেকেই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন কথা বলার শক্তি, চলাফেরাও অসম্ভব হয়ে উঠল। যান্ত্রিক কুশলতায় তাঁর দেহের নষ্ট কোষগুলি সরিয়ে নতুন কোষ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। মস্তিষ্কে রক্ত পেঁছে দেওয়া হচ্ছিল নিয়মিত, যাতে বেঁচে থাকতে পারেন। তাঁর অবশ্য কোনো যন্ত্রণা ছিল না শরীরে।



তুমি যেমন শান্ত হয়ে বসে যন্ত্রের কথা শুনছ ঠিক এভাবেই ওঁর মধ্যে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর ইচ্ছে সঞ্চারিত হল ক্রমেই নিঃশব্দে। পাশে থাকলে তুমি লক্ষ্য করতে, তিনি তার রোগা হ'তে থাকা হাতের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁর মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠছে। একবার তাঁর জায়গায় তুমি নিজেকে ভাব তো! তিনি যা অনুভব করছিলেন তখন তুমিও তাই অনুভব করতেঃ এক ধরনের হতবুদ্ধি, কিছুটা চাঞ্চল্য। ভাবতে, সবই একদিন সেরে যাবে। তারপর একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে তোমার মনে হল সবকিছুই অচেনা, যেন একটি আকাশযানে তোমাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তুমি বুঝতে পারলে তোমার গন্তব্য দূরে, অন্য কোথাও। তারপর থেকে দেখছ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তোমার শরীর ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, বদল করতে হচ্ছে জামাকাপড়, অথচ সবাই এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই হয় নি, কিন্তু তোমার চোখ এড়িয়ে তাদের যাতায়াতের চেষ্টা—সবই তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছ। কখনো যদি অনেক চেষ্টায় কাউকে ধরলে তৎক্ষণাৎ তুমি ব্যথাতুর হয়ে উঠতে তোমার দুর্বল-স্বাস্থ্য আর ছন্নতা সম্পর্কে তাদের দু একটা কথা শুনে অথবা উল্টোপাল্টা ভঙ্গী দেখে এবং অদ্ভুত এক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মানুষ বলেই মনে হত না তোমার, তোমার হাতের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছ ঠাণ্ডা, অ-বৈষয়িক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যে হাত দুটো কিনা দুর্বল ও গুটিয়ে যাওয়া; তারপরই একটা চূড়ান্ত স্থবিরতা, যা মৃত্যুর মত শীতল।

সবই তুমি দেখছ আর শুনছ, এই ঘরে কবরে শুয়ে থাকা স্থির অচঞ্চল হয়ে টি ভি দেখার মত। সাঁতার কাটার, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার, বনের ভেতর দৌড়ে বেড়ানোর স্মৃতি শব্দময় হয়ে ঝলকে উঠছে তোমার মনে, সিনেমার পর্দায় ছবি দেখার মত জীবন্ত অথচ কিছুই তোমাকে স্পর্শ করছে না, কোনো অর্থই বহন করছে না তোমার কাছে।



তুমি যন্ত্রের সমস্ত শব্দই শুনতে পাচ্ছ, যে কিনা যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে পরিবেশন করছে তার আবেগ এবং মুড, এবং তোমার মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে তিনি তোমার সামনেই রয়েছেন হয়ত। তাঁর মস্তিষ্ক থেকেই শব্দ আসছে এই শব্দ-যন্ত্রে। তোমার বুঝতে নিশ্চয় অসুবিধে হচ্ছে না, এখন তুমি তাঁর যে কণ্ঠস্বর শুনছ তা তিনিই রেখে গেছেন। এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বরই এখন তোমার আর তাঁর মধ্যে মিলনের সেতুটি বেঁধে রেখেছে, আর অন্য কিছু নয়। তুমি কিছুই বলছ না। এই তুমি, যে কিনা জীবিত একটি পদার্থ—চলাচল করতে পার, খেতে ও ঘুমোতে পার, তোমার সামনে এসে পড়া আলো-কে তাকিয়ে দেখতে পার, হয়ত হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপিও ব্যক্ত করতে পার। তুমি এখন যে কণ্ঠস্বর শুনছ তা তোমার কাছে প্রার্থনার মন্ত্রের মতও মনে হতে পারে! তুমি তোমার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনছ, যে এখন চিরতরে বিদায় নিয়েছে, অথচ জীবিত। এই কণ্ঠস্বর তখনও বলতে পারে ভালবাসার নতুন কথা যার কোনো প্রমাণ চাইবার দরকার হবে না, প্রয়োজন হবে না তাকে কেন্দ্র করে জীবন কাটাবার। শুধু শব্দই হবে অবলম্বন। যেন কোনো রূপকথার নায়ক-নায়িকার মত, যাদের একজন ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে কোনো গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখল এক অপরূপা নারীকে এবং নারীও দেখল তাকে, তারপর আর কোনদিনই দেখা হল না এ জীবনে, অথচ দুজনই দুজনকে স্বপ্ন দেখল আমৃত্যু। এক মুহূর্তের এই দেখার যে বিষয় তা অবিনাশী, যে কোনো বাস্তবতার চাইতেও অনেক বেশী বাস্তব। তুমি এখন যে শব্দ শুনছ তা সময়ের মতই প্রাচীন এবং তোমার ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে স্থির একটা মর্মর-ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করতে যে শুধু স্থির হয়ে শুনবে। তোমার উচিত ছিল যন্ত্রটার আরো কাছে আসা, অথচ চুপচাপ বসে রয়েছ এখনো। এখন শুধু শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়, বলা যায়, এটা হল শব্দের সময়—পারাপারহীন শব্দের সমুদ্র। বল, সোনা, সব কিছু আমায় বল। আমি শুনতে পাব। আমার একমাত্র ইচ্ছে শুধু তোমার কথা

শোনা। তুমি চুপচাপ বসে থাকো, বসে বসে শুনতে থাক অস্তিত্বহীনের কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর কিনা জাগিয়ে তুলছে চিরদিনের মত অকেজো হয়ে যাওয়া সময়কে। সে বলে চলেছে তোমার যৌবনের কথা, বলছে স্মৃতিতে তুলে রাখা ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনাগুলির কথা, যা কিনা রয়েছে একটি মেয়ের মনে যে ভালবেসেছিল একটি ছেলেকে। সবকিছুর নিখুঁত বর্ণনা তুমি শুনছ, সে তোমার ছেলের কথা বলছে, ছেলের ছেলেবেলার কথা, তার প্রথম উচ্চারণের স্মৃতি। বলছে তোমার মা-বাবার কথা, তোমরা যে বনে ঘুরে বেড়াতে দুজনে, সে বনের কথা, নদীর কথা, মেঘের কথা, সে মেঘের ভাঙা-গড়ার খেলা পৃথিবীতে সব থেকে সুন্দরতম ব্যাপার।

অনুবাদ : **অর্ধেন্দু চক্রবর্তী**

জুল ভের্ন

জুল ভের্ন সাইন্সফিকসানের জনক। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের সন্নিকটে ফায়েদ্যু দ্বীপে জন্ম। বাবা ভাল উকিল। বাবার ইচ্ছে ছেলে বড় হয়ে তাঁর পেশা গ্রহণ করবে।

ছেলেবেলা থেকে মনে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। কল্পনায় ভেসে পড়তেন নানা এ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নে। গাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ করে প্যারিতে এলেন আইন পড়তে। আইন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরিতে বসে অবিরাম এ্যাডভেঞ্চেরায়ের বই পড়তেন। এইসময় এ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কিত একটা বই লিখে ফেললেন। 'ভয়েজ একস্ট্রা অর্ডিনারি।' তেমন কাটতি হল না। বিয়ের পর খানকয়েক নাটক লিখলেন। এগুলোরও তেমন পাঠক পাওয়া গেল না।

দুবছর বাদে লিখলেন 'ফাইভ উইক ইন এ বেলুন।' বইটি বিক্রির মুখ দেখল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন ভের্ন। আগে এ্যাডভেঞ্চারের এমন বই পাঠকের হাতে আসে নি।

'টোয়েণ্টি থাউজ্যান্ড লীগস আণ্ডার দি সী' বইটি বইয়ের জগতে এক রেকর্ড বিক্রয়ের ইতিহাসই শুধু সৃষ্টি করে নি, বিশ্বের সব প্রধান ভাষায় অনূদিত এবং চলচ্চিত্রে রূপায়িত। এই বইটিতে ডুবোজাহাজের যে কল্পনা ছিল পরে সেই কল্পনা বিজ্ঞানীরা বাস্তব করে তুলেছিলেন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে। ১৮৬৭ সালে তিনি আমেরিকা মহাদেশে চলে গেলেন পাকাপাকিভাবে বাস করতে।

১৯০৫ সালে জুল ভের্ন-এর মৃত্যু হয়।



ইটারন্যাল অ্যাডাট
জুল ভের্ন

জারটগ খুব চিন্তিত বিষয় এই মানবজাতির অতীত এই জন্য বারান্দায় একা একা পায়চারী করছেন। কিছুতেই এই সমস্যার সূত্র আবিষ্কার করতে পারছেন না। অথচ জারটগ বিদ্বান এই পৃথিবীর ইতিহাসটা গুলে খেয়েছেন। বহু কিছু জানেন কিন্তু মানুষের অতীত নিয়ে ধাঁধায় পড়েছেন। তবে জারটগ আট হাজার বছরের ইতিহাস জানেন সেটা হল কিছু মানুষের মধ্যে ঝগড়ার ইতিহাস কেননা ছোট জায়গায় অনেক মানুষের ভীড় ফলে মারপিট গণ্ডগোল খুনোখুনি সেটা কোন ব্যাপারই নয়।

বার্লিন থেকে কেপহর্ণ কতটা দূর। সামান্য জায়গা অবশ্যি, এই জায়গা নিয়ে কম লড়াই হয় নি। মাটি বলতে ঐটুকুই। আশেপাশে তো শুধু জল আর জল। সমুদ্র ঘিরে রেখেছে সমস্ত পৃথিবীটাকে। আর এই মাটির জন্য রক্ত ঝরেছে প্রচুর।

জারটগ যে দেশের নাগরিক সেই দেশের পাঁচানব্বইতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল এই সেদিন। দেশের নামটিও অদ্ভুত। 'চার সমুদ্রের দেশ'। তার মানে এই দেশের চারপাশেই সমুদ্র। মাটি বলতে কোথাও নেই।

এই ছোট্ট দেশটায় তাই আট হাজার বছর ধরে মানুষ যুদ্ধ করেছে এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবার তারপর অন্যদেশের সঙ্গে। যুদ্ধের এই পদ্ধতিকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে তিনটি জাত মাথা চাড়া দিয়েছিল। কিন্তু

একটা জাত বাকী দুটো জাতকে হারিয়ে দিয়ে নিজেই দখল করে নিয়েছিল সব। তা ও প্রায় হয়ে গেল দশ বছর। অনেক রক্ত ঝরার পর স্থাপিত হয়েছে জারটগ-দের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য 'চার সমুদ্রের দেশ'।

জারটগ ভাবছেন এই মানুষ জাতটা কিভাবে এগিয়ে চলেছে ; প্রথমে লিখতে শিখল, তারপর সেই লেখা কপি করার একটা ছাঁচ তৈরী করল যাতে অনেক কপি এক সঙ্গে করা যায়।

এই ছাঁচ আবিষ্কার করেই বসে রইলেন না, অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে দিলেন। এমনি করেই এল কয়লা, স্টীম, মেশিন। জারটগের বাপঠাকুর্দা আকাশের বজ্রকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আবিষ্কার করল বিদ্যুৎ তাও হয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ বছর।

এত সব হয়েও মূল প্রশ্নের কোন সমাধান সূত্র আবিষ্কার করতে পারেন নি জারটগ। সেই জন্য জারটগ মাঝে মাঝেই মাঠে গিয়ে পায়চারী করতেন আর ভাবতেন মানুষ এই পৃথিবীর মালিক কিন্তু কে এই মানুষ। কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় ? সাংঘাতিক প্রশ্ন ! অবশ্যি ভূতত্ত্ববিদরা এর একটা উত্তর তৈরী করেছেন। ভূত্বক পরীক্ষা করে জানা গেছে পৃথিবীর বয়স চারশ বছর। চার সমুদ্রের এই দেশ। মহাদেশ বললেও ভুল হবে না। প্রথমে এই মহাদেশ ছিল জলের তলায়। মাটি পরীক্ষা করে তা বোঝা গেছে।

সমুদ্রের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে এই 'চার সমুদ্রের দেশ।' কিন্তু সকলের মনে একটা প্রশ্ন তা কিভাবে। কত বড় শক্তি জলের তলা থেকে এতবড় দেশটাকে তুলে দিয়েছে। এই সব তত্ত্বই জানা গেছে পাহাড়ের গায়ে সামুদ্রিক পলিমাটির স্তর পরীক্ষা করে।

এই সমুদ্র থেকেই তো এসেছে মানুষ, পশু, কচ্ছপ। মাটি হয়ে তারপরেই উঠেছে গাছপালা। ফলে নিজেরা যেমন বেঁচেছে অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। আবার কিছু প্রাণী আছে তাদেরকে সামুদ্রিক প্রাণী বলা চলে না। একদম সৃষ্টিছাড়া। সমুদ্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এদের নিয়েই জারটগ মহা সমস্যায় পড়েছেন, এরা এল কোথা থেকে। এই সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না জারটগ। আর একটা প্রশ্নও জারটগের মাথায় কিলবিল করছে। তাহল মানুষের পূর্ব পুরুষ। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন পৃথিবীর সব কিছুই এক সময় জলের তলায় ছিল। জলই সব। জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। তাহলে ঐ মাথার খুলিগুলো কিভাবে এল। ওগুলো কি তাহলে জলের তলায় ছিল। কিন্তু জারটগ মাটি খুঁড়তে গিয়ে অনেক মাথার খুলি দেখেছেন। মানুষের খুলিতে সন্দেহ নেই তবে তা বিভিন্ন সাইজের খুলি। দুই তিন হাজারের পুরানো কোনটা ছোট কোনটা বড়। তবে একটা জিনিষ জারটগ লক্ষ্য করেছে পরের খুলিগুলি আকারে অনেক ছোট তার মানে অতীতের মানুষ কি আজকের

মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান বেশী ছিল? অতীতকালের মানুষেরাই বেশী বুদ্ধিমান ছিল জারটগরা তাদের তুলনায় কিছুই নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার। বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যে! সেটা কি করে সম্ভব? পুরানো খুলিগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওদের বয়স বিশ হাজার বছর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে। কিন্তু এই সময়ের মানুষ কতখানি সভ্য ছিল না ইতিহাস কেউ জানে না।
কিন্তু ইতিহাস থাকবে না সেই মতো হতে পারে না। বিশ হাজার বছর আগেকার মানুষ জারটগদের থেকে অনেক ধীমান ছিল এই কথা শুনলে অনেকে হাসবে। সে যাইহোক তাদের সভ্যতা গেল কোথায়। চল্লিশ হাজার বছর পৃথিবীকে যারা দাপটে শাসন করেছে তাদের ইতিহাস গেল কোথায়। কোথায় গেল উন্নত সভ্যতার নিদর্শন। শেষ হয়েছে কি? সেই কারণেই কি জারটগের পূর্ব পুরুষরা লিখতে শিখেছে। বাষ্প চালিত মেশিন ও বিদ্যুৎ কারখানা তৈরী করেছে। সেইদিন থেকেই নতুন দিনের সভ্যতা শুরু।
অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি। এই সত্যের পিছনে রয়েছে শক্তি। এই শক্তি অলৌকিক। এই শক্তির দাস এই পৃথিবী। আট হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম মানব 'হেডম' আর প্রথম মানবী 'হিভা'। এদের বংশধররাই আজকের মানুষ। 'আদম আর ইভকেই অতীতে বলা হত 'হেডম' আর হিভা।' জারটগদের ভাষায় এই শব্দ নেই। এই বিস্ময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেছে। সমুদ্রের মাটির স্তরে যুগ যুগান্তের বিস্ময়। এই বিস্ময় মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে জারটগদের। একটা যুগ শেষ হয়েছে আর একটা যুগ এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে সভ্যতার পরিবর্তন। এতগুলি সভ্যতার উত্থান পতন সৃষ্টি লয় কি করে হয়। বিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে এই দেশে পাওয়া গেছে প্রকাণ্ড স্তম্ভ, সুদৃশ্য মর্মর মূর্তি, কারুকার্য করা পাথর, অস্ত্রশস্ত্র, বিচিত্র হরফ, এই থেকেই বোঝা যায় এই দেশ ছিল বেশ উন্নত।
কিন্তু জারটগের মনে প্রশ্ন এই দেশ ছিল তো জলের তলায়। ভাবতে ভাবতে জারটগের মাথা গরম হয়ে যায়।
হাঁটতে হাঁটতে বাগানে এল। সূর্য এখনো অস্ত যায় নি। সামনেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী উঠছে। ওখানেই বসবে ল্যাবোটরী। রাজমিস্ত্রীদের জিনিষপত্রের দিকে তাকিয়ে জারটগ ভাবছেন এই বাড়ী কবে শেষ হবে।
এই সময় একটা গর্তের মধ্যে চোখ পড়ল জারটগের। গর্তের মধ্যে মাটি চাপা একটা আধখানা জিনিস। হাত তুলে নিলেন। একটু নেড়ে চেড়ে দেখলো জিনিষটা একটা আধার। অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরী। এই রকম ধাতু জারটগ এর আগে কখনো দেখেন নি। ধূসর রঙ, খসখসে চেহারা। বহুদিন মাটি চাপা থাকায় তেমন উজ্জ্বল নয়। একটা জায়গায় ফাটা। মনে হল একটা কোটা। জারটগ খুলতে গেলেন কিন্তু খুলল না, ভেঙ্গে গেল। দেখা গেল ভিতরে একটা

অদ্ভুত ধরনের জিনিষ। কতগুলি জিনিষ রোল করে পাকানো। ছোট ছোট অক্ষরে কি যেন লেখা আছে গায়ে। অক্ষরগুলি অদ্ভুত। জারটগ কোনদিন দেখে নি। আবিষ্কারের আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। জিনিষটা নিয়ে ল্যাবেটরীর টেবিলে গিয়ে বসলেন। আরম্ভ হল জারটগের গবেষণা। কিছুতেই বের করতে পারছেন না। এক বছর নেন। দু বছর গেল।
তারপরেই জারটগ ধরে ফেললেন ভাষার সূত্রটা। একটু একটু করে পড়তে আরম্ভ করলেন। জারটগ পড়ে ফেললেন কিন্তু পড়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করলেন। কাহিনীটা লেখা ডায়েরী লেখার ভঙ্গিমায়।—



২৪মে, ২ ··· ··· ··· সাল রোজারিও।
আরম্ভ করবো কিভাবে তা ঠিক করতে পারছি না। কাহিনী শুরু অনেক আগে থেকেই। সমস্ত ব্যাপারটাই মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়েছিল। তবে আমি মনস্থির করেছি আমি আমার মাতৃভাষা ফরাসীতে লিখে রাখবো।
হ্যাঁ, আমি ফরাসী। টাকা উপায় করতে এসেছি মেক্সোতে। আমার একটা রুপোর খনি আছে। আমার অনেক টাকা। এই সমস্ত টাকা নিয়ে দেশে গিয়ে বাস করবো।
সমুদ্রের পাড়েই রোজারিও। পাহাড়ের কাছেই আমার বাংলো। ছবির মত দেখতে। বাংলো থেকে সমুদ্র দেখতে ভাল লাগে। বাংলোর পিছনে পাহাড়। পহাড়ের মধ্যে কতবার ফ্রেঞ্চ মোটর নিয়ে উঠেছি। উপরে উঠবার বাঁধানো রাস্তা আছে। বাংলোয় থাকে আমার পুত্র জ্যাঁ, পালিত কন্যা হেলেন আর চাকর বাকর। আমার ইচ্ছা ছিল হেলেনকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব কিন্তু সেই ইচ্ছাটা আপাতত স্থগিত আছে।
চব্বিশ তারিখে বাগানে বসে গল্প করছিলাম খোশ মেজাজে। অতিথি রয়েছে কয়েকজন। অতিথিদের মধ্যে আছে মেক্সিকান, অ্যাংলো ম্যাক্যন। ডক্টর বাখুষ্ট অ্যাংলো স্যাক্সন দলের লীডার। ডক্টর মোরেনে মেক্সিকান দলের লীডার। দুজনের মধ্যে মনের মিল দারুণ।
কিন্তু কারোর কথার সঙ্গে মিল নেই। কারণ তর্ক লেগেছিল দু'জনের মধ্যে। ডক্টর বাখুর্স্ট ধার্মিক মানুষ কাজেই তিনি বললেন ভগবানই আদম আর ইভকে তৈরী করেছেন। ওদের দু'জন থেকেই পরবর্তী কালে মানুষ এসেছে। ডক্টর মোরেনো কথাটা জানতে পারলেন না হেসে উড়িয়ে দিলেন। ডক্টর বাখুর্ষ্ট

উত্তেজিত হয়ে বললেন, বিজ্ঞান অনেক কিছু করতে পারে তাই বলে মহান শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না।

এই সব আলোচনায় শেষ পর্যন্ত আলোচনা থাকে না ঝাগড়া থেমে যায় এই জন্য আমি বললাম অন্য কথা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের কথা। আমি বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কথাই বলতে চাইলাম।

প্রেসিডেণ্ট মেন ডোজা বললেন, বিজ্ঞানের কথটা ঠিক নয়। দেশের উন্নতি এর আগেও হয়েছিল তা এখন লোপ পেয়ে গেছে। যেমন ব্যাবিলন।

অনেকে মুখটিপে হাসলেন। ব্যাবিলনের সভ্যতার সঙ্গে দু'হাজার বছরের সভ্যতার সঙ্গে তুলনা চলে না। প্রেসিডেণ্ট কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয় বললেন—মিশরীয়রা কম যায় কিসে।

এই কথা শুনে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। প্রেসিডেণ্ট আবার বললেন—আটলাণ্টিয়ানদের ঘটনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কত সভ্যতা যে তার তলায় তলিয়ে গেছে কে জানে।

ডক্টর বাথুস্ট উত্তেজিত হয়ে বললেন, পৃথিবী যদি জলের তলায় তলিয়ে যায় তাহলেও তার চিহ্ন থেকে যাবে। সভ্যতার চিহ্ন থাকবেই। অতীতে সেরকম কোন কিছু থাকতো তাহলে তাদের কোন না কোন চিহ্ন থাকতোই। প্রেসিডেণ্ট মেন ডোজা একটু থেমে গিয়েছিলেন কিন্তু হারবার পাত্র নন। বললেন—এই পৃথিবীটাই যে একদিন জলের তলায় তলিয়ে যাবে না এই রকম কি কোন কথা আছে।

এই কথা শুনে আমরা বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু একটা আওয়াজ শোনা গেল তখনি। থর থর করে শরীর কাঁপছে। মাটি যেন নীচে নেমে যাচ্ছে। বাংলোটা কেঁপে উঠল।

আমরা সকলেই হকচকিয়ে গেলাম। আমাদের চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সকলেই চিন্তিত। নিজেদের একটু সামলে নিয়ে যেই উঠতে যাচ্ছি তক্ষুনি বাংলোটা ভেঙ্গে পড়ল হুড়মুড় করে। দেখি মাটির তলায় চলে গেলেন মেন ডোজা আর আমার চাকর জার্মেন।

একটু পরেই আমার মাসী চেঁচাচ্ছে সমুদ্র! সমুদ্র! চোখ ঘুরিরে তাকাতেই দেখলাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সমুদ্র চলে এসেছে বাগানে। পাহাড়টা তলিয়ে গেছে জলের তলায়। আমার মাসী র‍্যালে চেঁচাচ্ছে, সমুদ্র আসছে, সমুদ্র আসছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সমুদ্র আসছে না আসলে আমাদের বাংলোটা সমুদ্রের তলায় চলে যাচ্ছে। আমার তখন কাণ্ডজ্ঞান নেই কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। বললাম গাড়ী বার করো। গাড়ী আনতেই গাড়ীতে উঠে বসলাম। স্প্রিং ধরে ঝুলতে লাগল র‍্যালে। গাড়ী ছুটছে। আর পেছনে জল তেড়ে আসছে। এই বুঝি গাড়ীটাকে গ্রাস করে নেবে।

দেখতে দেখতে জল পেঁছে গেল পেছনে। তখুনি ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী লাফিয়ে গেল। র‍্যালের স্ত্রী চীৎকার করছে। র‍্যালে জলের মধ্যে পড়ে গেছে। মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। চেঁচামেচি করছে। এই সময় গাড়ীটা থেমে গেল। ইঞ্জিন খারাপ। আমি বললাম। সিমোনাট দেখাল সামনে কোন রাস্তা নেই। কে যেন জমি কেটে নিয়েছে। পিছনে জল। সামনে খাদ। মাঝখানে আমরা। সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। অমাদের মোটর গাড়ীও যাচ্ছে না। কপালে যে কি আছে কে জানে। এই সব ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম কি আসে। তন্দ্রার মত। এমনসময় প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠলাম। জল আসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমস্ত পৃথিবী যেন লয় হয়ে যাচ্ছে। তারপর সব শেষ হয়ে গেল। ভোর হল। আকাশ ফর্সা হল।



২৫শে মে।

সকাল বেলায় দেখলাম আমরা একটা দ্বীপের মধ্যে আছি। দ্বীপের চারপাশে জল ছাড়া আর কিছু নেই। ক্ষিদে আর জল পিপাসায় আমাদের দেহ অবশ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। বাঁচার কোন আশা নেই। মরতেই হবে। ৪ঠা জুন, 'ভার্জিনিয়া'র ডেক।

ভার্জিনিয়া জাহাজটা মেলাবার্ন থেকে ছেড়েছিল একমাস আগে। চব্বিশে মে রাত্রিতে ক্যাপ্টেন দেখতে পায় বড় বড় ঢেউ। পৃথিবীতে কি ঘটে গেল তা জানে না।

মেক্সিকোর কাছে এসে দেখল শুধু জল আর জল। মাঝে একটা দ্বীপ। রোজারিও নেই। মেক্সিকো নেই। ছোট্ট দ্বীপে পরে আছে এগারটি নিথর দেহ। দু'জন মারা গেছে।

বাকী নয়জন বরাত জোরে বেঁচে গেছি। ক্যাপ্টেন আমাদের তুলে নিলেন নিজের জাহাজ ভার্জিনিয়ায়।

জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী

জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী ঠিক মনে করতে পারছিনা সমাজের হিসাব হারিয়ে ফেলছি। আর এই সব হিসাব রেখেই বা কি হবে।

ক্যাপ্টেন আমাদের নিয়ে মেক্সিকোর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না। শুধু জল আর জল। এক সময় জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে

গেল। জাহাজের পাল তুলে দিল। খাবারও শেষ। সকলেই কম করে খাচ্ছে। এই সময় আমরা ঝড়ের মধ্যে পড়লাম। একটানা পঁয়ত্রিশ দিন ঝড় চলল। উনিশে আগষ্ট আকাশে রোদ উঠতেই কমপাস নিয়ে বসল ক্যাপ্টেন। দ্রাঘিমা আর লঘিমা দেখে বলল আমরা যেখানে ভাসছি, এই জায়গাটা ছিল পিকিং। এর অর্থ হল দুটি মহাদেশই তলিয়ে গেছে। আরো কিছুদূর গিয়ে প্রমাণ পেলাম তিব্বত নেই, হিমালয় নেই, ভারত নেই। চারপাশে শুধু জল আর জল।

এই ভাবেই আমরা ভেসে চললাম দিনের পর দিন মাসের পর মাস। মহাদেশের অতল সমাধি দেখে আমরা আর চমকে উঠছি না। কারণ আমাদের চোখ সহ্য হয়ে গেছে। আমরা আর বলতাম না এইখানে ছিল মস্কো, ওয়ারশ, বার্লিন, ভিয়েনা, রোম, টিম্বাকটু, সেণ্টলুশ্ট, মাদ্রিদ।

প্যারিসের ওপর দিয়ে যাবার সময় সিমোনাট কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এই খানেই ছিল ওর মাতৃভুমি। এডিনবরাও নেই, লণ্ডনও নেই।

আমাদের খাবার শেষ হল। আমরা সাতমাস না খেয়ে থাকলাম। তারপর মাটি দেখলাম। ডেকে এসে দেখি। আমরা যে মাটি দেখেছি সেই মাটি নয়। কোন জনপ্রাণী নেই।

গাছপালা নেই। মাঝে মধ্যে কালো পাহাড় রয়েছে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে খাল রয়েছে জাহাজ সেই খালে গিয়ে ভিড়ল। পাহাড়ের মধ্যে অনেক হ্রদ রয়েছে। হ্রদের জল পান করার মত নয়। নোনতা। জমিতে কাদা ছিল। এর অর্থ এই পাহাড় আটলাণ্টিকের তলায় ছিল। মানুষ নেই কিন্তু মাছ, চিংড়ী, কাঁকড়া প্রচুর। এই সব দেখে জীভে জল এল না। খেয়ে মরতে হবে না। জাহাজ থামল দীর্ঘ আটমাস পর। এই ভাবেই আমাদের জীবন যাত্রা নতুন করে আরম্ভ হল।

এই খানেই পড়া শেষ করল জারটগ। নষ্ট হয়ে গেছে অনেক পাণ্ডুলিপি। এরপরে যা আছে তা ছেঁড়া। সেই ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি পড়তে লাগল জারটগ। ধীরে ধীরে সব কিছু সহ্য হয়ে যাচ্ছে। একদিন ডক্টর মোরেনা বললেন, আমরা এখানে ছয় মাসের মতো।

—ছ মাস! কিভাবে কেটে গেল এই দেশে। এই ছ'টা মাস যে কিভাবে গেল তা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। কারণ এই ক'দিন আমরা ঘুরেছি খাবারের চিন্তায়। মাছ আছে অনেক কিন্তু ধরা মুস্কিল। কাছিমের ডিম কত আর খাওয়া যায়।

ভার্জিনিয়ার পালটা খুলে কোন প্রকারে একটা তাঁবু বানিয়েছি যাতে মাথা গোঁজা যায়। ভাল করে বানাতে গেলে আরো সরঞ্জাম চাই তা পাওয়া গেলে ভাল করে বানানো যাবে এই ভেবে রেখেছি।

কখনো কখনো গুলি করে পাখী মেরে খাই। প্রথমে কিন্তু আমরা পাখী দেখিনি তারা বোধ হয় আমাদের ক্ষিদে নিবারনের জন্য চলে এল। উইলো, অ্যালবেট্রস আবরা কতরকম যাযাবর পাখী আমাদের তাঁবু ঘিরে থাকতো। পাখীগুলি কাছে এসেই মরে যেত আমরা মরা পাখী খেতাম। গুলি আর খরচ করতে হত না।

হঠাৎ জাহাজের খোলে এক বস্তা গম আবিষ্কার হল, আমাদের কি আনন্দ। সবাই বললে, বস্তাটা সরিয়ে রাখা হোক রুটি করবার জন্য। আমরা কিন্তু তা করলাম না অর্ধেকটা গম মাটিতে ছিটিয়ে দিলাম যাতে ফলন বাড়ে। মাটিতে নুন ছিল কিন্তু এখন আর নেই। নদীর জলে ধুয়ে মুছে গেছে। ফলে মাটিতে গম চাষ হতে পারে।

আবার এর মধ্যে দুজোড়া খরগোস পালিয়ে গেছে, মাটিতে তাহলে নিশ্চয়ই কচি ঘাস-পাতা হয়েছে। তাই খাচ্ছে। কিছু দিন পর নিশ্চয়ই গাছপালা হবে। ইতিমধ্যেই প্রচুর পাখী এসেছে। গমের চাষ ভালই হয়েছে। পাখীরাও গম খাচ্ছে।

আমাদের মধ্যে ক'জন মারা গেছে সে কথা বলেছি। মারা গেলেও আমাদের সংখ্যা কমেনি, বেড়েছে। আমার ছেলে ও হেলেনের ছেলেমেয়েই তো তিনজন। আরো তিনটি সংসারেও ছেলেমেয়ে রয়েছে।

ফলে বচ্চা কাচ্চাদের মুখ দেখে আমাদের মনে সাহস ফিরে এল।

দশ বছর পর আমরা আবার দেশ দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। এতদিনে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছুটে গিয়েছিল। অ্যাজোরস, ম্যাডিরা এই দুটো আগ্নেয়গিরি আটলাণ্টিকের তলায় কম উৎপাত করেনি। এই দুটো আগ্নেয়গিরি দেখবার জন্য একটু ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম জমাট লাভার স্তর। আগ্নেয়গিরির চিহ্ন নেই। আগ্নেয়শিলা রয়েছে।



এই সময় আমরা আবিষ্কার করলাম অ্যাজোরস আগুন পাহাড়ের অংশে থাম, থালা বাসান ও প্রস্তর মূর্তি। সেইগুলি দেখে মনে হল এই সভ্যতা আমাদের নয়। এই সভ্যতা—লস্ট আটলাণ্টিস।

ডক্টর মরোনা ঠিকই ধরেছেন। সেই সদুর অতীতে আটলাণ্টিস জলের তলায় চলে গিয়েছিল আবার ফের জেগে উঠেছে। অদ্ভুত লীলা। আটলাণ্টিসের গল্প কথা অলীক নয়।

কিন্তু এই সব নিয়ে ভাববার সময় আমাদের নেই। আমরা এখন বাঁচতে চাই। খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। এই মাটিতে প্রচুর গাছ হয়েছে। খুব সম্ভবত পাখীরা বীজ এনে ছড়িয়ে দিয়েছে। চারপাশে প্রচুর গাছ হয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে খটকা লাগছে এই সব গাছপালা এর আগে কোনদিন দেখিনি। আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। এরা হয়তো একদিন জলের তলায় ছিল, এখন মাটি পেয়ে বন তৈরি করছে। মাঝে মাঝে হ্রদ রয়েছে ওখানে রয়েছে অসংখ্য মাছ। মাছেরা আবার উড়তে পারে। মাছ না বলে পাখী বলাই ভাল।—

শেষ পৃষ্ঠাগুলি ঠিক রয়েছে তা পড়তে গিয়ে জারটগ অভিভূত হয়ে গেলেন।

ক্যাপ্টেন মরিস মারা গেলেন। আমরাও যাবো, আমাদেরও অনেক বয়েস হয়ে গেছে।

মৃত্যুর দিন গুনছি আমরা। আমার বয়েস আটষট্টি, ডক্টর বাথুশর্ট এর পঁয়ষট্টি। ডক্টর মোরেনার ষাট। কাজেই আমাদের মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছে যে কোনদিন মরতে পারি। এর মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই সব লিখে কি হবে ? আমাদের বংশধররা কি এই সব পড়বে, দেখবে।

আমাদের এই কলোনীর চেহারা পাল্টাচ্ছে ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও বাড়ছে। কারণ জায়গাটাতো ভাল।

কিন্তু এইভাবে বংশধর বৃদ্ধি হোক আমরা তা চাইনি। এই চেষ্টা কিন্তু মরিসের মধ্যে ছিল। আজ সে চলে গেল।

এই কলোনীতে শিক্ষিত বলতে আমি আমার ছেলে, ডকটর বাথুর্শট, ডক্টর মোরেনা। কিন্তু সারাদিন ঘুরছি ক্ষিদের জালায়।



পেট ছাড়া আর কিছুই চিন্তা নেই মাথায়। আমরা আস্তে আস্তে পশু হয়ে যাচ্ছি। খালাসিদের কথা নয় বাদ দিলাম ওরা চিরকালই পশু ছিল। মস্তিষ্কের কোন কাজ ছিল না, ওরা অশিক্ষিত। তাহলে আমরাও ওদেরই দলে পড়ে গেলাম।

ভাগ্যিস আমরা কয়েকটা দেশ দেখে এসেছিলাম। 'ভার্জিনিয়া' ভেঙ্গে পড়েছে। প্রথম প্রথম আমরা কয়েকটা ঘর বানিয়েছিলাম এখন আর বানাই না। কি হবে তৈরী করে। আমরা এখন সব কিছু খোলা আকাশের তলায় করি।

আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাদের জামা কাপড় শেষ হয়ে গেছে কবে। প্রথম প্রথম সামুদ্রিক শৈবাল জুড়ে কাপড় বানিয়ে ছিলাম এখন আর বানাই না

আমরা এখন উদম। উদম হয়েই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমাদের কোন লজ্জা নেই।
বর্বর অসভ্যরা যেমন ঘুরে বেড়ায়। আমাদের কোনো কাজ নেই। একমাত্র কাজ হচ্ছে খাওয়া। খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই।
আমাদের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে আমার ছেলের মধ্যে রয়েছে। সে তো এখন নাতিপুতি নিয়ে ঘর করছে। তবু আমাকে বাবা বলে জানে। আর জানে আমার পুরানো ড্রাইভার—সিমোনাট। তবে এই মনে রাখা কতদিন চলবে? কে জানে। মানে মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এখনই এই অবস্থা। এর পরে যারা আসবে তারা তো পশু হয়ে জন্মাবে। চোখের সামনে দেখছে বাচ্চারা বুনো হয়ে বড় হচ্ছে। না জানে লিখতে না জানে পড়তে। শুধু জানে খেতে। ভালভাবে কথাও বলতে পারে না।
দাঁত লম্বা লম্বা। এর পর চিন্তা শক্তি ব্যাপারটা মোটেই থাকবে না।
ঠিক পশুরা আগে যেমন ছিল। এরা জানবেও না এদের পূর্ব পুরুষরা কি দারুণ বিজ্ঞানী ছিল।
আমরা একটা চেষ্টা করবো আমাদের ইতিহাস লিখে যেতে। সেইজন্য জাহাজ থেকে কাগজ কালি এনে লিখে রাখলাম এই পাণ্ডুলিপি।



ডক্টর মোরেনা মারা গেছেন, ডক্টর বাখুর্ট ও নেই। আমি এখন মৃত্যুর দিন গুনছি। জাহাজ থেকে একটা শাবল এনেছিলাম। সেইটা মাটিতে ঢুকিয়ে রাখলাম। তারপাশেই এই পাণ্ডুলিপিটা একটা অ্যালুমুনিয়ামের কৌটায় ভরে পুঁতে রাখবো। এই হবে আমার শেষ কাজ। বিদায়! মানুষ। বিদায়।
জরটগ অবাক হয়ে গেলেন। মিস্ত্রীরা বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে অনেক খুঁড়েছে কিন্তু কোথাও লোহার সিন্দুক পায়নি। লোহার সিন্দুক মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কৌটা নষ্ট হয়নি সেইজন্য পড়া গেল এই পাণ্ডুলিপি। জারটগ ভাবলেন তার অনুমান মিথ্যে নয়। পাথরের স্তরের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রাচীন সভ্যতা বিরাজ করছে। কেননা অনেক বছর আগে এই অট্টালিকা মূর্তি যারা তৈরী করেছিলেন, নিশ্চয় তারা সভ্য মানুষ ছিলেন।
পাণ্ডুলিপির মধ্যেই লেখা রয়েছে তারাই আটলান্টিয়ান। একদিন আটলাণ্টিস মহাদেশ ডুবে গিয়েছিল জলের তলায়। আজ যেখানে জারটগদের শহর গড়ে

উঠছে। এক সময় এইখানেই নেমে ছিলেন ডুবে যাওয়া জাহাজের অবশিষ্ট মানুষেরা।

জারটগদের মধ্যে—'হেদম' কথাটা নিয়ে কত তর্কবিতর্ক হয়ছে। এখন জানা গেল এর রহস্য। 'হেদম' এসেছে 'এদেম' থেকে। 'এদেম' এসেছে 'আদম' থেকে। এই আদম হচ্ছে ডুবে যাওয়ার প্রথম মানুষ 'আদম'।

আদম—এদেম হেদম। এই কথাগুলি নিয়ে কত কল্পনা। মনে হয় এই কথা-গুলি এসেছে 'উদম' থেকে। এই সব সভ্যতা জলের তলায় তলিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মানুষের সভ্যতাও তলিয়ে গেছে।

জারটগের বুঝতে কোন অসুবিধা হল না মানুষের মধ্যে চলছে খেলা, সেটা হল —সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তার মানে মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে উঠছে আবার জলের তলায় চলে গিয়ে মুছে যাচ্ছে। এই খেলা চিরকালের। আরম্ভের পর শেষ। শেষের পর আবার আরম্ভ।

এই ভাবেই হয়তো জারটগদের দেশ 'চার সমুদ্রের দেশ।' জলের তলায় চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে জারটগদের ইতিহাস জলের তলায় শেষ হয়ে যাবে। কেননা এই জারটগদের তুলনায় পাণ্ডুলিপি—লেখকের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত মানুষের সভ্যতা। তাদেরটা যখন শেষ হয়ে গেছে, জারটগদেরটা শেষ হবে না এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই।

অনুবাদ : **জীবন সরকার**

রে ব্র্যাডবারী

রে ব্র্যাডবারীর সম্পূর্ণ নাম রেমন্ড ডগলাস ব্র্যাডবারী। ইলিনসিস এ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাডবারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। পড়াশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক কিছু তাকে করতে হত। এই কাজগুলো করার জন্য সময়টাকে এমন সুন্দর ভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন যাতে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ছোটবেলা থেকেই ব্র্যাডবারী নাটুকে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাকে প্রতিদিন ভোরে কাগজ বিক্রী করতে হত। কিন্তু এত সব করার পরও তাঁর যেদিকে সর্বাগ্রে নজর থাকতো তা হচ্ছে তার লেখা। তিনি নিয়মিত লেখার চর্চা চালিয়ে যেতেন লেখক হওয়ার জন্য।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাডবারী একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটি বেশিদিন টিকে থাকে নি। এর তিন বছর পর তিনি তাঁর প্রথম লেখা গল্প পেন্ডুলাম বিক্রী করে দেন সুপার সাইন্স স্টোরিজ কাগজের কাছে। চল্লিশ দশকের শেষাশেষি এসে ব্র্যাডবারী লিখতে শুরু করেন বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে বিস্ময়কর গল্প। পরে এই সমস্ত বিস্ময়কর গল্পগুলো দি মারশিয়ান ক্রনিক্যালস (ইউ এস ১৯৫০) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এই সংকলনের পর থেকেই ব্র্যাডবারীর নাম ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তিনি ক্রমশ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন বিজ্ঞান গল্পের আসরে।

ব্র্যাডবারীর লেখা নাটক উপন্যাস ফ্যান্টাসি এবং চলচ্চিত্র সবকিছুই কল্পনাশ্রয়ী। তিনি কল্পবিজ্ঞানের লেখায় একটা আলাদা জগত তৈরী করে দিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত ব্র্যাডবারীর লেখা নিয়ে দূরদর্শনের জন্য বহু চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। ব্র্যাডবারীর লেখা বইগুলোর মধ্যে অন্যতম ঃ ডার্ক কার্নিভাল। দি ইলাস্ট্রেটেড ম্যান। ফারেনহাইট ৪৫১। দি গোল্ডেন অ্যাপলস অফ দি সান। এ রেডিয়াম ফর মেলানকলি।



সাউণ্ড অফ থাণ্ডার

এ্যাসকেলস্ বিস্ময়ে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বচ্ছ জলের নীচে থেকে যেন ফুটে উঠেছে লেখাগুলো। অন্ধকার ঘরের মধ্যে, সামনের দেওয়ালে শুধু কথাগুলো জ্বলজ্বল করছে,—

সময়—সফর—কোং ; ফিরুন অতীতের যে কোন বছরে। শিকার করুন। শুধু অতীতের প্রাণীটির নামটি বলুন, আপনাকে আমরাই সেই অতীত প্রাণীটির কাছে নিয়ে যাব।

আপনি প্রাণীটিকে গুলিবিদ্ধ করে উত্তেজনার আনন্দ লাভ করুন।

লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে দুঁধে শিকারী এ্যাস্কেলসের চোখদুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। খুশীর ঝলকে গলা বুঁজে আসে তার। খুশীর ঝিলিকে গলা দুটে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ডান হাতটা আপনা থেকেই সামনে এগিয়ে আসে। ডান হাতের আঙ্গুলে ধরা দশ হাজার ডলারের চেকটা সামনের ডেসকের পিছনে বসা লোকটার দিকে এগিয়ে দেয় এ্যাস্কেলস্।

একটু পরে দ্বিধান্বিত গলায় বলে এ্যাস্কেলস্,—অতীত দিনের এই সফর শিকার থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্বতো নিচ্ছেন আপনারা ?

—নাঃ সেসব কোন দায়িত্বই নিই না আমরা। শুধু আপনি যে অতীত দিনে ফিরে গিয়ে আপনার ইচ্ছামত প্রাণী ডাইনোসরসকে দেখতে পাবেন, সেটুকু দেখানোর দায়িত্বই আমাদের।—টেবিলের অন্যধারে বসা কর্মচারীটি বলে উঠে।

—দেখুন, সামনে যিনি দাঁড়িয়ে তিনি হচ্ছেন মিষ্টার ট্র্যাভিস, আপনার এই অতীত সফরের গাইড্। ইনিই বলবেন কখন, কাকে গুলি করবেন। মনে রাখবেন, মিষ্টার ট্রাভার্স যদি বলেন না ; গুলি করবেন না, ব্যাস, গুলি করা বন্ধ রাখবেন। এসব আমাদের কঠিন নিয়ম। না মানলে আবার দশ হাজার ডলার ফাইন, তার উপর গভর্মেণ্টের জরিমানা, বা শাস্তি সে তো আলাদা থাকবেই।—কাটাকাটা, পরিষ্কার স্বরে কোম্পানীর নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেয় মানুষটি।

এ্যাসকেলস্ কর্মচারীটির কথাগুলো শুনতে শুনতে অফিস ঘরটার দিকে ভাল করে তাকায়। ঘরজুড়ে, দেওয়ালজুড়ে তার। ছোট বড় বাক্সর মধ্যে দিয়ে সেই তারগুলোা এদিক ওদিক, নানানদিকে চলে গেছে। ঘরের মধ্যে কখনও রুপালী,কখনও নীল, কখনও বা কমলা রঙের ঝকমকে আলো জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ভেসে উঠছে শব্দ গুম্‌গুম্ গুম্‌গুম্। মনে হচ্ছে দূর, ব—হুদূর, বহু দীর্ঘ সময়ের ওপার থেকে যেন এই শব্দ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে বনানীর প্রান্ত থেকে একঝিলিক আগুন যেন হু—হু, হু—হু করে ঝলকে উঠছে।

এ্যাসকেলস্ বাতাসের দিকে হাত বাড়াতেই ঝলসে উঠা আগুনের হলকা নিমেষে নিভে গেল। রুপালী—কমলা—নীল রঙের আলোর ঝর্ণা বদলে গেল অন্য রঙে।

বাতাসে হাত দিলেই যে সব বদলে যায় এই প্রথম বুঝতে পারল এ্যাসকেলস্। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এই 'সময় সফর' কম্পনীর বিজ্ঞান ভাষাগুলোকে। মনে রাখবেন আপনার হাতের সামান্য স্পর্শে এই ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সব কিছুরই অদল বদল করে দিতে পারি আমরা। পোড়া জিনিষ, ধুলো, কয়লার যুগ পেরিয়ে যেমন আজকে নূতন বানিজ্য যুগে এসেছেন, তেমনি হাতের স্পর্শ আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সুদূর অতীতে যখন সবুজ বন আর অরণ্যের জগত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না আপনার চারপাশে। অতীতে, গোলাপের সুগন্ধ নেই, বয়সভারে নুব্জ মানুষ নেই, সেযুগে শুধু অজানা গাছ পালা জন্তু-জানোয়ারের সমাবেশ। আপনার জরা-মৃত্যুকে মুহূর্তে অতিক্রম করে ফিরে চলুন অতীতে। সেই সুদূর অতীতে যখন ফিরবেন, দেখবেন, উল্টোদিকে পরিক্রমনের ফলে সূর্য উঠছে উল্টোদিকে পশ্চিমকাশে, অস্ত যাচ্ছে পূবে, চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে উল্টোভাবে। আপনার মনে হবে সে যেন এক উল্টাপুরাণ। উল্টো চীনা ম্যাজিক মনে হবে, যেন টুপী থেকে খরগোস না বেড়িয়ে খরগোশ থেকেই যেন টুপী বেরুচ্ছে। অতীত বছরের এমন সব আশ্চর্য জগতে আমরাই নিয়ে যাব আপনাকে শুধুমাত্র আপনারই হাতের স্পর্শে। আসুন, আসুন আমাদের কাছে।

টাইম-মেশিনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বলে এ্যাসকেলস্—হ্যাঁ, যতসব বুজরুকি, বোকা।—টাইম মেশিনের আলো তখন সিঁদুর হয়ে পড়েছে এ্যাসকেলসের মুখে। তবুও দ্বিধাস্বরে সামনে বসে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে,—এসব চুলোয় যাক্। ডাইনোসেরস্ সত্যি মারতে পারব কিনা বলুন ? টাইরেনোসঅরাস রেক্স ? ভয়াবহ সরীসৃপ অতীতের বৃহত্তম ভয়ংকর জানোয়ার ? তাকেই দেখতে চান ? শিকার করতে চান ? উত্তম, আসুন, এই চুক্তিপত্রে সই করুন। চুক্তির মোদ্দা কথা ডাইনোসেরস্ আপনি দেখবেন চাইলে শিকারও করতে পারেন। তবে আপনার জন্য আমাদের কোম্পনী বিন্দুমাত্র দায়ী থাকছে না। এটাও মনে রাখবেন, অতীত জগতের ঐসব ডাইনোসেরস যেমন হিংস্র, ভয়াবহ, তেমনি ক্ষুধার্ত। সামান্য ভুল, মানেই মৃত্যু।

এ্যাসকেলাস রাগে রাঙা হয়ে উঠে। চিৎকার করে উঠে,—দশ হাজার ডলার কবুল করে নিয়ে এখন ভয় দেখাচ্ছেন, যাতে অতীত দিনের সফর শিকারে না যাই ?

—তা মশাই কথাটার প্রথম অংশ সত্যি না হলেও শেষাংশতো সত্যিই। আমরা মশাই আগেভাগেই সবকিছু পরিষ্কার বলতে চাই। মুখের কথাতেই যারা ভয় পায়, তাদের অতীত সফর শিকারে না যাওয়াই ভাল। শুনুন মশাই গত বছরের খতিয়ান মতে, ছয়জন সফর শিকারীর দলপতি শুধু গত বছরেই মারা পড়েছেন, আর ১২ জন শিকারী গতবছর নিহত হয়েছে অতীত বন্যজন্তুর হাতে। আমাদের কাজ শুধু ফেলে আসা অতীত জগতে নিয়ে যাওয়া, অতীতের জন্তু জানোয়ারকে দেখিয়ে শিকারীদের আনন্দ দেওয়া উত্তেজনার খোরাক যোগানই আমাদের কাজ। ছয় কোটি বছরের অতীতকে ফিরে দেখার উত্তেজনা দেবে এই টাইম মেশিন। শেষ মুহূর্তে একবার ভেবে নিন্ মিস্টার এ্যাসকেলস, এই সময়—সফরে যাবেন কিনা ? বিপদ আছে, ভয় আছে, উত্তেজনাও আছে। যদি যেতে না চান, নিন্ আপনার দশ হাজার ডলারের চেক, ছিঁড়ে ফেলুন। ঠকাবাজি করা আমাদের কম্পানীর কাজ নয়।

এ্যাসকেলস্ চেকটার দিকে সিঁদুর হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ ! ডান হাতের মুঠোটা কয়েকবার খুলে বন্ধ করে উত্তেজনাকে চাপতে চায়। শেষ বলে,—ঠিক আছে। সফরে যাওয়াই যাক্।

—যাত্রাশুভ হোক মিস্টার এ্যাসকেলস্। ডেস্কের অন্যধারে বসা লোকটা বলে উঠে।—মিস্টার ট্রাভার্স, এই আপনার ক্লায়েণ্ট। নিয়ে যান এঁকে অতীতের সফরে।

—ট্রাভার্সের পিছনে পিছেন এ্যাসকেলাস "টাইম মেসিনের" দিকে এগিয়ে যায়। এগোবার আগে, বিশেষ আলোকরশ্মিযুক্ত রে-গানটা এগিয়ে দেয় এ্যাসকেলসকে। নিজেও একটা তুলে নেয় পাশের আলমারী থেকে। বলে,—

বন্দুকটা বেহাত করবেন না। সাবধান।—তারপরই রুপালী ধাতবযুক্ত টাইম মেশিনের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে দুজনে। সহস্র আলোকচ্ছটায় ধাঁধিয়ে যায় মুখ এ্যাসকেলসের।

চালু হোল টাইম-মেশিন। গুরু-গুর, গুর-গুর, গুর-গুর একটা দিন পিছনে ফিরে গেল এ্যাসকেলসরা। তারপর একটা সপ্তাহ তা—রপর একটা মাস তা—রপর মুহূর্তে একটা বছর ফিরে গেল অতীতে তারা। তখনও মেশিন চলছে গম-গম্, গম-গম্, গম-গম্ ২০৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তারা ফিরল ২০১৯ খৃষ্টাব্দে। তারপর আরও অতীতে ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৯৫৭-ও পার হোল।—আরোহীরা প্রস্তুত হোন। আমরা দ্রুত ফিরে যাচ্ছি অতীতে।—গর্জন করে মেশিন।

ট্রাভার্স দ্রুত অক্সিজেন হেলমেটটা চাপিয়ে নিল মাথায়। ইনটারকম চালু হোল কিনা পরখ করে নিল। দেখাদেখি এ্যাসকেলস্ও মাথায় অক্সিজেন হেলমেট চাপিয়ে ফেল্ল। পুরু গদি আঁটা সিটে বসে এ্যাসকেলস্ তখন দুলে যাচ্ছে মেশিনের থরথর কাঁপুনীতে। উত্তেজনায় চোয়াল দুটো দৃঢ় হয়ে গেছে তার, ঠোটদুটো কিছুটা ভয়ে পাঁশুটে। উত্তেজনায় আর ভয়ে কখন যে বন্দুকের উপর আঙ্গুল চেপে বসেছে তার, খেয়ালই নেই এ্যাসকেলসর। খেয়াল করতেই দেখল ভয়ে তার আঙ্গুলগুলো কাঁপছে। ভাল করে চাইতেই দেখতে পেল এ্যাসকেলস টাইম মেশিনের মধ্যে শুধু যে সে আর এই সফরের লিডার আছে তা নয় আরও আছে মিস্টার লেসপেরান্স, ট্রাভার্সের এ্যাসিটেন্ট, আর বিলিংস ও ক্রেমার, অন্য দুজন সফর-শিকারী!



মনে মনে চিন্তা করল এ্যাসকেলস্, বাপ্রে, আমাকে বাদ দিয়েও চারজন শিকারী লাগছে? চিন্তার ব্যাপার নিশ্চয়ই। এ্যাসকেলস তাই ইণ্টারকমের মাধ্যমে বলে উঠল,—আমার হাতের এই বিশেষ বন্দুক ভয়ংকর ডাইনোসেরসকে মেরে ফেলতে পারবে?

হেলমেট রেডিওর মাধ্যমে ট্রাভার্স উত্তর পাঠাল মুহূর্তে,—পারে। যদি গুলিটা সঠিক জায়গায় লাগাতে পারেন। মনে রাখ্বেন স্যার, কিছু কিছু ডাইনোসেরসের দুটো ব্রেন আছে। একটা মাথায়, অন্যটা শিরদাঁড়ার বেশ নীচে। মনে রাখবেন, এই দুই জায়গার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে আমাদের। প্রথমে সেজন্য দুটো গুলি ছুঁড়ুন ডাইনোসেরসের দুচোখে। অন্ধ করে দিন।

ব্যাস্, তারপর গুলি মারুন মাথার ব্রেনে ও শিরদাঁড়ার ব্রেনে।

তারপর কেঁপে উঠল টাইম মেসিন।—বন্ধুগণ, আমরা ১কোটি বছর পিছনে ফিরে গেছি। খ্রীষ্টের জন্ম বছরের যুগ বহু আগে ফেলে এসেছি আমরা। বাইরের দিকে তাকান। এ যুগ, খ্রীষ্টপূর্ব যুগ।

চমকে উঠে এ্যাসকেলস। টাইম মেশিনের স্বচ্ছ ধাতব আস্তরন দিয়ে সামনে তাকায়। একি! ঘর-বাড়ী জনবসতী কোন কিছুই নেই! অরণ্য আর অরণ্য! একি সব অজানা জীবজন্তু? ইলিনয়স্ শহর আফ্রিকার গভীরতম জংগলের চেয়ে ভয়াবহ এখন! মিঠি মিঠি হাসি ফুটে উঠে এ্যাসকেলসের মুখে। ভাবে, সত্যিই, তার এই সফর, যে কোনও শিকারীর কাছে ঈর্ষার বস্তু।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর মেসিন গরর-গর গরর-গর, গরর-গর শব্দ করতে করতে ঝাকুনী দিয়ে নিস্তেজ হয়ে শেষে থেমে যায়।

—মিস্টার এ্যাসকেলস, আমরা এখন যে অতীত সময়ে ফিরেছি, এই সময়ে যীশুখ্রীষ্ট জন্মান নি। মোয়েসেস ভগবানের সংগে কথা বলার জন্য পাহাড়ে যান নি। পিরামিডের সৃষ্টি হয় নি। মনে রাখবেন, আলেকজাণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ম, হিটলার কেউই জন্মান নি এই সময়ে। এ যুগ, আপনার কল্পনার বাইরের প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ।—বলে উঠে গাইড লিডার ট্রাভার্স।

ট্রাভার্সের কথার সংগে তার সহকর্মী লেসপারেন্স, আর অন্য দুজন শিকারী বিলিংস্ ও ক্রেমার মাথা নেড়ে নেড়ে কথার সমর্থন জানায়।

টাইম মেসিন ধাতব গলায় বলে উঠল,—বন্ধুগণ আমরা এসেছি ৬ কোটি বছরের অতীত দিনে। সামনের ঐ ৬ কোটি বছরের অতীত জংগলে আপনাদের শিকার আনন্দময়, উত্তেজনাময় হোক্।—টাইমমেশিন শুভেচ্ছা বাণী শেষ করে।

ট্রাভার্স টাইমমেশিন থেকে সামনের ধাতব রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে—মিষ্টার এ্যাসকেলস, সামনের ঐ রাস্তা ধরেই আপনি আপনার শিকার যাত্রা শুরু করবেন। খেয়াল রাখবেন, এই ধাতব রাস্তা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ছয় ইঞ্চি উচুতে ঝুলে আছে। মাধ্যাবিকর্ষণযুক্ত হওয়ায় এই ধাতব রাস্তা মাধ্যাকর্ষণ প্রতিহত করে শূন্যে ঝুলে আছে। এই ধাতব রাস্তা ধরে অতীত পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে ইচ্ছামত ঘুরতে পারেন।

—এই রাস্তার দুপাশে বিরাট বিরাট ফার্ণ, পাম গাছ দেখছি। বিদঘুটে ডালপালা মেলে অজানা গাছও প্রচুর। দূরে বাষ্পাচ্ছন্ন জলাশয় দেখা যাচ্ছে। এ সবই ৬ কোটি বছর পুরানো দিনের পৃথিবীর চেহারা?—এ্যাসকেলস্ অবাক গলায় প্রশ্ন করে।

—এইই হচ্ছে অতীত দিনের চেহারা। মানুষের মত উঁচু যেগুলোকে গাছ ভাবছেন, সেগুলো গাছ নয়। ঘাস, তৃণ। ২000 খ্রীষ্টাব্দে তৃণের এই দল পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল হয়ে গেছে সভ্যতার চাপে। তাই ঐ গাছকে আপনার অচেনা

মনে হচ্ছে। বাষ্পাচ্ছন্ন জলাশয় কিন্তু জলাশয় নয়। পৃথিবীর অন্তস্থল থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসছে এটা তারই ছবি। মিষ্টার এ্যাসকেলস্, নামুন টাইম মেশিন থেকে। ধাতব রাস্তা ধরে খুশীমত যেখানে ইচ্ছে ঘোরাফেরা করুন। শুধু সাবধান, ধাতব রাস্তা থেকে কিছুতেই অতীত পৃথিবীর মাটিতে পা দেবে না। অতীত পৃথিবীর গাছ-পালা, কোন কিছুকেই স্পর্শ করবেন না। —পুনর্বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে ট্রাভার্স।

—কেন ?—অবাক গলায় বলে এ্যাসকেলস্।

—অতীতের এই নির্জনতার গাছপালা, পশু-পাখী এক নিবিড় ভারসাম্যতায় আবদ্ধ। পাখীর কূজন বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করছে, দূর সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়া বাতাসে যে আঘ্রাণ আনছে, তারাই তৃণাঞ্চলকে দ্রুত সমৃদ্ধ করছে ফুল-ফলে, বনকে সুমধুর করছে। এই ভারসাম্য রক্ষা করতে হোলে বর্তমান পৃথিবীর কারুর স্পর্শ অতীতের পৃথিবীতে পড়া উচিত নয়।—ট্রাভার্স ধীরে ধীরে বলে।

—কিছুই পরিষ্কার বুঝলাম না মিস্টার ট্রাভার্স।

—দেখুন, আমরা বর্তমানের মানুষ, এই ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মানুষ। আমরা অতীতের জগতে এনেছি আপনাকে কিন্তু তার পরিবর্তন ঘটুক সেটা আমাদের সময় সফর কম্পানীও চায় না, বর্তমান সরকারও চায় না। কোন পরিবর্তন ঘটবে না এই চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হবার প্রতিশ্রুতির গ্যারাণ্টিমানি হিসাবে ১ কোটি ডলার সরকারে জমা রাখতে হয়েছে আমাদের। আমরা চাই না তা বাজায়প্ত হোক। তাই বলছি। আমাদের তৈরী ঐ ধাতব বাস্তায় শুধু চলতে পারেন। কোন জিনিষ স্পর্শ করার অধিকার আপনার নেই।

—কিন্তু কেন মিস্টার ট্রাভার্স ? আমার হাতের স্পর্শে অতীতের পৃথিবীর এই জগতে এমন কি বিপর্যয় ঘটবে ?—এ্যাসকেলস্ জেদ ধরে উত্তরের জন্য।

—বেশ, বুঝুন ব্যাপারটা। ধরুন, দৈবাৎ আপনি চলতে গিয়ে একটি ইঁদুর মারলেন এই বনে। ফলে কি হোল জানেন, ভবিষ্যতে, এই ইঁদুর গোষ্ঠি থেকে ক'জাতের যে ইদুর বংশের জন্ম হোতো তারা নিঃশেষ হয়ে গেল। গেল কিনা ?

—হ্যাঁ, তা বোধ হয় গেল।—আমতা আমতা করে বলে এ্যাসকেলস্।

—তাহলে এই ইঁদুর থেকে তার বংশ, তার বংশ থেকে তার বংশ, তার বংশ থেকে পরের বংশ আর জন্মাল না। অর্থাৎ ৬ কোটি বছর আগে একটি ইঁদুর মারার ফলে, হয়ত একজাতের কোটি কোটি ইঁদুর নিঃশেষ হয়ে গেল ৬ কোটি বছর পরের পৃথিবীতে, অর্থাৎ এই ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। বুঝলেন ?

—বুঝলাম। কোটি কোটি ইঁদুরই না হয় শেষ হয়ে গেল। তাতে আজকের পৃথিবীর কি ক্ষতি হোল ? ইঁদুরতো পৃথিবীর পক্ষে এমন কোন দামী জিনিষ নয়।—এ্যাসকেলাস্ বেশ বিরক্ত যেন।

—কি ক্ষতি হোল ?—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গর্জে উঠে ট্রাভার্স।—আরে, তার ফলে

যে পৃথিবীর পরিবেশ ভারসাম্য ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে গেল। কেমন করে? সেটাই বুঝুন। ইঁদুর খেয়ে বাঁচত খরগোশরা। ইঁদুর না থাকায় তাদের খাদ্যে ঘাটতি হোল। খোরগোশ খাদ্যের অভাবে তাই মারা পড়ল। খরগোশের বংশ এর জন্যই হ্রাস পেতে লাগল। আবার খরগোস ধরে খেত বনশেয়ালরা। খরগোশ কমে গেছে। ফলে বেশ কিছু শেয়াল খাদ্য না পেয়ে নিঃশেষ হোল সংখ্যায়, প্রচুরভাবে। আবার শেয়াল ধরে খায় যেসব হিংস্র জানোয়ার যেমন বাঘ সিংহ, তাদেরও ঘাটতি হোল খাদ্যে। ফলে বাঘ, সিংহও কমে যেতে লাগল। এমনি করেই দেখা যাবে, একটি ইদুর মারা যাবার ফলে ধীরে ধীরে খরগোশ, শেয়াল বাঘ সিংহ সবারই সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পেল। এই যে একে অন্যকে জীবন দিয়ে খাদ্য জোগায় এইতো পরিবেশ ভারসাম্যের মূলকথা। আবার দেখুন, জন্তু-জানোয়ার যখন কমে যাবে এইভাবে, তখন এই ছ কোটি বছরের পুরোনো পৃথিবীর যে গুহামানুষ, তাদেরও খাদ্যে ঘাটতি দেখা দেবে। খাদ্যের অভাবে হয়ত তাদের অনেকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে বহু আগে। আর গুহামানুষ নিঃশেষ হওয়া মানে এই আমার আপনার মত আশ্চর্য আজকের মানুষ জাতিরই, তখন অনেকাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যদি তাই হয় তাহলে, ছ কোটি বছরের পুরোনো পৃথিবীতে একটা ইঁদুর মারার ফলে, এই ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীতে এক জাতের মানুষ গোষ্টিই হয়ত থাকবে না। কারণ একটা গুহা-মানুষ থেকে ছ কোটি বছরে কত বিরাট জনসমষ্টির সৃষ্টি হতে পারে কত মানব জাতীর। কে জানে, যে গুহামানব মারা পড়ল, তার থেকেই হয়ত সৃষ্টি হয়েছিল রোমান সভ্যতার। ফলে, রোমান সভ্যতার আদিতম গুহামানব মারা যাবার ফলে রোমান সভ্যতাই হয়ত সৃষ্টি হোল না। ভাবুন মিস্টার এ্যাসকেলস্, সেই ঝুঁকি কি নেওয়া যায়?

—নাঃ, তা যায় না। না হয় জন্তু জানোয়ার মারলাম না, কারণ তাতে প্রাণী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। কিন্তু আপনাদের ধাতব রাস্তা থেকে নেমে দুপাশের সবুজ ঘাসে পাদিলে এমন কি ক্ষতি হবে?

—ক্ষতি হবে, হবে মিস্টার এ্যাসকেলস্। একগুচ্ছ ঘাসের ধ্বংস হওয়া মানেও আবার সেই বিপর্যয়, পরিবেশ ভারসাম্যে। ঘাস জোগাচ্ছে প্রাণী জগতের খাদ্য ভাণ্ডার। তাই একগুচ্ছ ঘাস বিনষ্ট হওয়া মানেই, ছ কোটি বছরে, কয়েক কোটি তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্যের অভাব ঘটান, মানে তারই ফলশ্রুতিতে মাংসাশী প্রাণীর খাদ্যেও ঘাটতি হওয়া। দেখুন, সেই ভারসাম্য বিপর্যয়ের কাহিনীই আবার আসছে মিস্টার এ্যাসকেলস্। তাছাড়া আপনার আমার ধাতব জামা-কাপড়, এই ধাতব ঠাণ্ডা, সবই বিশেষ প্রথায় পরিশোধিত। মাথার অক্সিজেন হেলমেট থেকে আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি, পিঠের চোঙ্গায় তাকে ত্যাগ করছি প্রশ্বাসের মাধ্যমে। ফলেই আমরা অতীত পৃথিবীর আকাশ বাতাস, কোন

কিছুকেই দূষিত করছি না। আমরা অতীতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে চাই না। আমরা অতীত পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেই সব কিছু করতে চাই।

—মিস্টার ট্রাভার্স, তাহলে ডাইনোসেরস শিকার করা যাবে না?

—যাবে, নিশ্চয়ই যাবে মিস্টার এ্যাসকেলস্ তার জন্যই তো আপনি দশ হাজার পাউন্ড দিয়েছেন। যে ডাইনোসেরসকে আপনি মারবেন, তার গায়ে বিশেষ লাল চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে।

—সে কি! কেন?—অবাক গলায় প্রশ্ন করে এ্যাসকেলস্।

—যে সব জন্তুর মৃত্যু সময় এসে গেছে শুধু তাদেরই আমরা লালচিহ্ন এঁকে দিই স্পটিং গান দিয়ে। আর তা করার জন্য আমরা রওনা হবার আগে আজই আমি আমার সাকরেদ লেসপ্যারেন্সকে স্পটিংগান দিয়ে জন্তু বাছাই করার কাজ সেরে আসতে বলেছিলাম। লেসপ্যারেন্স সে কাজ করে ফেরার পরই আমরা সময় সফরে বেড়িয়েছি। পেইন্ট বম্-এ দাগ কাটার সংগে সংগে আমাদের খাতায় উঠে গেছে, কোন জন্তু ঠিক কখন, ঠিক কটার সময় মরবে। মিস্টার এ্যাসকেলস, আপনাকেও ঠিক সেই সময়েই জন্তুটাকে গুলি করতে হবে। এর ফলে, যার মরার কথা সেইই মরছে ঠিক সেই সময়েই। তা যেভাবেই হোক্। এতে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে না। মনে রাখবেন, জন্তুটা মরবার ঠিক দুমিনিট আগে তার সামনে আপনাকে পেঁছে দেব। আপনি মাত্র দুমিনিট সময়ের মধ্যে জন্তুকে মেরে ফেলবেন।

—ধরুন যদি না মারতে পারি তাহলে? আমাদের কি জন্তুটা আক্রমণ করবে? আমরা কি তখন সবাই বেঁচে ফিরতে পারব?



কথাটা শুনে ট্রাভার্স তাকাল তার সাকরেদের দিকে। তারপর বল্ল—সময়সফরে এরকম বিপর্যয় ঘটে না, ঘটা উচিত নয়। যদি তা ঘটেই, তাহলে মুহূর্তকাল সময়ে ঝাকুনি খেয়ে সবকিছু সামলাতে হবে। যেমন ধরুন, প্লেনে চড়ে আকাশে ভাসতে ভাসতে যাবার সময় বাতাসশূন্য এয়ার পকেটে পড়ে প্লেন মুহূর্তকাল ঝাঁকুনী দিয়ে নেমে যায় তারপর আবার দ্রুত উঠে, সামলে নিয়ে এগিয়ে চলে, ঠিক তেমনি, টাইমমেসিন ঝাঁকুনি দিয়ে বেসামাল সময়কে সঠিক করে নেবে। লক্ষ্য করেছেন বোধহয়, টাইম মেশিন ঝাঁকুনি দেবার পর থামল। কারণ এই ঝাঁকুনির মাধ্যমে সময়কে বর্তমান থেকে এই ছ কোটি অতীত বছর নিয়ে আসতে পারল। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার সেই দৈত্যকার প্রাণী

ডাইনোসেরস দেখাবার দায়িত্ব আমাদের। কোনটাকে মারবেন, চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি বিপর্যয় ঘটে, তাতে আপনার প্রাণ যাবে কিনা, সে বিষয়ে কিছুমাত্র দায়িত্ব আমাদের নেই।

—ওঃ।—ম্লান হাসি হাসে এ্যাসকেলস।

—তৈরী হন। এবার টাইমমেশিন থেকে রাস্তায় নামব।—ট্রাভার্স রেডিও যন্ত্র মারফৎ সব্বাইকে জানিয়ে দেয়।—সবাই টাইম মেশিন ছেড়ে ধাতব রাস্তায় নেমে আসে।

চারদিক জুড়ে জংগল। ছোঠ বড় দীর্ঘ গাছ ছেয়ে আছে জংগলকে। আকাশ ভরে আছে সুমধুর কূজনে। মাঝে মাঝে পতপত আওয়াজ ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে তারে কাপড় যেন হাওয়ায় উড়ছে। এ্যাসকেলস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শব্দের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল বিরাটকায় টেরাডেকটাইল তার বিরাট ধূসর রঙের পাখা মেলে পতপত শব্দ করে এগিয়ে আসছে। বিরাট সাইজের বাদুড় উঁচু গাছের মাথায় চিক-চিক-চিক শব্দ করছে। এসব শব্দ মিলে অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ছকোটি বছরের পুরোনো পৃথিবীর জংগলে।

উত্তেজিত হয়ে উঠে এ্যাসকেলস। ধাতব রাস্তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাগ করে এ্যাসকেলস টেরাডাকটাইলের দিকে।

'থামুন।—গর্জে উঠে ট্রাভার্স।—খবর্দার খেলাচ্ছলেও বন্দুক তুলবেন না। ভুল করে যদি এই রে-গানের থেকে গুলি ছুটে যেত, তাহলে—

—বাঃ, ডাইনোসেরস না পেলে টেরাডাকটাইলকে শিকার করব না?

লেসপারেন্স তার হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলে,—সময় হোল। এগিয়ে চলুন। আমরা ৬০ সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর লেজ দেখতে পাব। ডাইনোসেরসের গায়ে তখন পেইণ্টটা আছে কিনা দেখে নেবেন। মনে রাখবেন, তবুও না বলা পর্যন্ত রে-গান চালাবেন না। আর ধাতব রাস্তা থেকে কক্ষনো মাটিতে নামবেন না।

—আশ্চর্য।—অবাক গলায় বলে এ্যাস। বলল, এখন থেকে ছ কোটি বছর এগিয়ে আমরা ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জগতে বাস করি। গতকালই কিথ আমাদের নূতন প্রেসিডেণ্ট হলেন। আমাদের দেশে কি হৈ-চৈ চলছে। আর এখানে, গভীর-গহণ অজানা জন্তু পশু-পাখী-গাছপালার অরণ্যে আমরা একি অবাক ব্যাপার-স্যাপার করছি? জন্তুকে দেখেও গুলি ছুঁড়ব না? রাস্তা থেকে মাটিতে নামব না? মজা পেয়েছে নাকি?

—চুপ। আস্তে। রে-গানের সেফটি ক্যাচ খুলে প্রস্তুত হোন।—ফিসফিস করে অর্ডার করে সফরি নেতা 'ট্রাভার্স'।—এ্যাসকেলস আপনি প্রথমে রে-গান ছুঁড়বেন, তারপর বিলিং, তারপর ক্র্যামার।

—কেন, আমি কি বিরাটকায় ডাইনোসেরসের গায়ে রে-গান চার্জ করতে ফেইল করব? শুনুন মশাই আমি বহু বাঘ, ভালুক, হাতি, বুনো শুয়োর, বাইসন

মেরেছি। আমাকে আনাড়ি শিকারী ভেবেছেন? আমার পরে আর তিনজন শিকারীর বন্দুক চালাবার দরকার হবে না।

—আহ্, চুপ।—ধমকে উঠে ট্রাভার্স।—সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়।

ট্রাভার্স মুহূর্তপরে ডানহাত তুলে ধরে। খুব নীচুস্বরে বলে উঠে,—ঐ, ঐ ঘন ঝোপের নীচে, আবছা মত দেখাচ্ছে। ঐ যে, ঐ তো, ঐ বিভীষিকাময় ডাইনোসেরস।

'—ডাইনোসেরস!—অবাক বিস্ময়ে সামনে তাকায় এ্যাসকেলস্।

জংগলে ভেসে উঠে মড়মড় শব্দ। দৈত্য যেন গাছপালা দুমড়ে চলেছে। তারপরই সব চুপ। তারপর ভেসে উঠে কর্কশ—বিচিত্র প্রতিধ্বনির মত শব্দ। সামনে এসে মাথা উচু করে, যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়ায় টাইবেনোসেরস চেক্সী। এ্যাসকেলসদের থেকে মাত্র একশ গজ দূরে।

—বাপরে! কি বিরাট! কি বিভৎস, ভয়ংকর।—চিৎকার করে উঠে এ্যাসকেলস্।

—চুপ্—ধমকে লঠে ট্রাভার্স।

বিরাটকায় দৈত্য, চকচকে মসৃণ তৈলাক্ত দেহ নিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে বিরাট থ্যাপথ্যাপে লম্বাটে পায়ের পাতা ফেলে ফ্যাৎ-ফ্যাৎ শব্দ করে এগিয়ে এল। ত্রিশ ফুট লম্বাটে দেহ নিয়ে ড্যাবড্যাবে চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল, বিরাটকায় সরীসৃপ ডাইনোসেরস্। ডাইনোসেরসের নীচের দুটো পা যেন ইঞ্জিনের পিস্টনের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী। হাজার টন ওজনের সাদা হাড় জুড়ে রয়েছে কতকগুলি রশির মত মজবুত পেশী যা মুহূর্তে দুধর্ষ শক্তি জোগান দিচ্ছে বিরাটকায় সরীসৃপে ডাইনোসেরসকে। জন্তুটার প্রত্যেকটি থাই এর মাংসের ওজন একটন তো হবেই। আর উপরের দুই বাহুকে পা না বলে হাত বলাই ভাল। ক্রেনের বাহুর মত ডাইনোসেরসের সামনের দুই বাহু ঠিক হাতের মত সামনের যে কোন বস্তু, গাছপালাকে জড়িয়ে ধরছে ছেলে-খেলার মত করে। আর সামনে মানুষ পড়লে, ডাইনোসেরসের কব্জায় ঠিক পুতুলের মত খেলত। সরীসৃপ ডাইনোসেরস যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় মনে হয়, আকাশটাই বুঝি ছুঁয়ে ফেল্ল। আর মাথাটা? স্রেফ একখণ্ড নিটোল পাহাড়ের মত কঠিন ঋজু। মাঝে মাঝে, গর্জে উঠছে ডাইনোসেরস। মনে হচ্ছে, দুসারি ঝকঝকে ধারালো ছুরি যেন ঝলকে উঠছে। লকলকে জিভ সাপের জিভের চেয়েও দ্রুত বাইরে বেরিয়ে ক্ষুধার জানান দিচ্ছে। চোখ দুটো রাঙা ডিম্বাকৃতি। পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে যখন সামনে এগুচ্ছে, পিছনের লেজের বিরাট ওজনের চাপে গাছপালা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। যখন সামনে এগুচ্ছে, মুহূর্তে কয়েকশো ফুট এগিয়ে যাচ্ছে। হিংস্র মূর্তি নিয়ে মাত্র তিনশফুট দূরে দাঁড়িয়ে ডাইনোসেরস হুংকার দিয়ে উঠল ইয়া—বা—বা। তারপর

সামনের দুই বাহুকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল কর্কশ হুংকরে। হিংস্রতায় দুসারী ঝকঝকে দাঁত আকর্ণ বিস্তৃত হোল।
—হে ভগবান! কি ভয়াবহ দৃশ্য!—ভয়ে, বিহ্বলতায় চিৎকার করে উঠল এ্যাসকেলস। —এই জন্তু যা বিরাট, তাতে এতো আকাশও ছুঁতে পারে আমাদেরও ধরে ফেলতে পারে।
—চু—উ—প।—হিস্ হিস করে গর্জে উঠে ট্রাভার্স।—দেখছনা, ও এখনও আমাদের দেখতে পায় নি।
—এই দৈত্যকে মারা? অসম্ভব।—স্বতসিদ্ধের মত বলে উঠে এ্যাসকেলস্। হাতে ধরা রেগানটা ঝুলে পড়ে, যেন ওটা নেহাতই অকেজো একটা টুপী।—মূর্খ না হোলে এই দানোকে মারবার কল্পনা করে কেউ?
—চুপ্।—নীচু গলায় ধমকে উঠে ট্রাভার্স।
—বাপরে। জন্তু তো নয়, স্রেফ দুঃস্বপ্ন।—মোহগ্রস্থের মত বিড়বিড় করে বলে এ্যাসকেলস্।
—আহ! তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াও। ফিরে চল জলদি টাইম মেসিনে। আমাদের কথার অবাধ্যতার জন্য বিনা শিকারেই তোমার অর্ধেক টাকা বাজায়াপ্ত হোল।
—বিশ্বাস করুন, ডাইনোসেরস এত যে ভয়ংকর, ভীষণকায় আমার ধারণাতে ছিল না। আগে জানলে আসতাম না এই সফর শিকারে। এবার আমি ফিরে যেতে চাই।—আকুতি এ্যাসকেলসের গলায়।
—এখন বড় দেরী হয়ে গেছে। ঐ জন্তু এখন আমাদের দেখে ফেলেছে।
—আরে ঐ ডাইনোসেরের বুকে লাল চিহ্ন। তাহলে ওকেই আমাদের শিকার করার কথা!—বিস্মিত চীৎকার এ্যাসকেলসের গলায়।
ভয়ংকর সরীসৃপ এতক্ষণে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে বসেছিল। এইবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। একবার এপাশ-ওপাশে হেলিয়ে গাটা ঝাড়া দিয়ে নিল। মনে হোল, সহস্র সবুজ রঙের টাকা যেন আলোয় ঝলসে উঠল। গা ঝাড়া দিতেই, গায়ের সবুজ টাকার রাশি থেকে অজস্র ধূলিকণা, মাটি, আকাশে চার-পাশে ছিট্কে পড়ল। সরীসৃপের নিঃশ্বাসে যেন আগুনের হল্কা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারদিক ভয়ংকর করে তুলল।
—আহা।—আর্ত চিৎকার ভেসে উঠল এ্যাসকেলসের।—নিয়ে চল, এখান থেকে আমায় নিয়ে চল। ঐ, ঐ ডাইনোসেরস আমায় গিলে ফেলবে, মেরে ফেলবে।—ভয়ে পাংশুটে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে এ্যাসকেলস।—আমি ভাল গাইড চেয়েছিলাম যাতে কোনও বিপদে না পড়ি। নাঃ, নাঃ, তোমরা ঠগ-জোচ্চার। তোমরা গাইড নও।—পাগলের মত চিৎকার করতে থাকে এ্যাসকেলস।—আমি বহু শিকার করেছি বহু জন্তু দেখেছি, কিন্তু এটা জন্তু নয়, এটা দানো, এটা দুঃস্বপ্ন!—ভয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে এ্যাসকেলস! তারপর ছোটবার চেষ্টা করে সামনে।

—মিস্টার এ্যাসকেলস, ছুটবেন না। ওদিকে যাবেন না। ফিরুন, ফিরুন। ফিরে চলুন টাইম মেসিনে।—চিৎকার করতে থাকে ট্রাভার্সের এ্যাসিটেণ্ট মিস্টার লেসপারেন্স।

ছুটতে চাইলেও কিন্তু ছোটা হয় না এ্যাসকেলসের। ভয়ে অবশ হয়ে যায় পাদুটো। অসহায় চাহনীতে সামনে তাকায় সে।

—এ্যাসকেলস।—শম্বিত ফেরাবার চেষ্টা করে ট্রাভার্স।

চিৎকারে যেন জীবন্ত হয়ে এ্যাসকেলস। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সামনের দিকে, ডাইনোসেরসের দিকে এগুতে থাকে।

—নাঃ, নাঃ, ওদিকে নয়। ওদিকে নয়।—সাবধান বাণী ধ্বনিত হয় ট্রাভার্সের গলায়।

মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকারে ক্রমেই যেন ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে ডাইনোসেরস। তারপর তীব্র চিৎকার আকাশ মথিত করে সামনে কয়েক পা ছুটে আসে। মাত্র চার সেকেণ্ডে অতিক্রম করে বিরাটকায় সরীসৃপ একশ গজ দূরত্ব। ট্রাভার্স—এ্যাসকেলসদের থেকে ডাইনোসেরসের ব্যবধান তখন স্বল্পমাত্র।

—সাঁ, সাঁ—মুহূর্তে একঝলক গুলি ছুটে যায় এ্যাসকেলসের রিভলার থেকে। মুহূর্তে আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে আসে ভয়ংকর ডাইনোসেরসের লেলিহান মুখগহ্বর থেকে। সবুজ বর্ণ রক্তে রাঙ্গা হয়ে যায়।—হি—হা—হা,—কর্কশ হিংস্রতায় ধারালো দাঁতের সারি বিস্তৃত করে ডাইনোসেরস।

এ্যাসকেলাস স্থানু মত স্থির হয়ে যায়। কোন কিছুই যেন তার উপলব্ধিতে নেই। তারপর, শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত হেঁটেই চলে সামনে। ধাতব পথের প্রান্তে, একেবারে প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন সে। তারপর মাটির পৃথিবীর ছয় ইঞ্চি উপরের, মাধ্যাকর্ষণহীন ধাতব পথ থেকে নেমে পড়েছে অতীত পৃথিবীর সবুজ মাটিতে। এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। মখমলের মত সবুজ গুল্মচ্ছাদিত মাঠের মধ্যে পা বসে যাচ্ছে এ্যাসকেলসের। তবু যেন যন্ত্রচালিত মেসিনের মত এগিয়েই চলেছে সে। কিছু উপলব্ধি নেই, তখন পিছনে কি ঘটছে, কি করছে ট্রাভার্স আর তার সঙ্গোপাঙ্গরা।

সাঁআও, সাঁআও—আবার ছুটে যায় আগুনে 'রশ্মি' রে-গান থেকে। রে-গানের শব্দ, ভয়ংকর সরীসৃপের আর্ত চিৎকারধ্বনির মধ্যে হারিয়ে যায়। ডাইনোসেরসের বিবর্ণকায় ভারী পুচ্ছসম পিছনের অংশটা যেন ঝুলে নেমে যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ডাইনোসেরস পৈশাচিক চিৎকারে এগিয়ে যায় এ্যাসকেলসের দিকে, চোখে খুনী জন্তুর রক্তলোলুপতা। মনে হয় কত দ্রুত এ্যাসকেলসকে বাহু দিয়ে নিষ্পিষ্ট করে, দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করবে, তারই উল্লাস ঐ খুনে জন্তুটার চোখে।

ট্রাভার্সের স্থির নিশানা এবার ডাইনোসেরসের দুই ডিম্বাকৃতি চক্ষুতারকায়।

নিখুঁত লক্ষ্য বিদ্ধ করে দুই চক্ষুতারকাকে। আগুনের ঝলক সোজা আঘাত করে ডাইনোসেরসের দুই মণি তারকায়।
হিমতুষারস্তূপের মত, বিরাটকায় মর্মর মূর্তির মত ধরাশায়ী হয়ে যায় ভয়ংকর —হিংস্র সরীসৃপ টাইরোনেসেরস রেক্স। পতনের মুহূর্তেও, চারপাশের গাছপালা ভেঙ্গে ধরাশায়ী হয় ডাইনোসেরসের বিরাট ওজনের চাপে। ডাইনোসেরসের শরীরের পুচ্ছ এসে আঘাত করে ধাতব-রাস্তার গায়ে। দুমড়ে-মুচড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ধাতব-রাস্তা।
ট্রাভার্স আর তার তিনসংগী দ্রুত পিছনে পালিয়ে যায়, টাইম মেশিনের দিকে। তারপর আবার গর্জে উঠে রে-গান, সুঁই—সাঁই। ডাইনোসেরসের পুচ্ছ শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঝলক-ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসে শরীর থেকে। কর্কশ রক্তের বন্যায় ভরে যায় ক্রমে নিথর হয়ে যায় সরীসৃপ ডাইনোসেরস।
আর্ত চিৎকার ক্রমে মিলিয়ে যায়। এ যেন হিমতুষারস্তূপের স্খলনের পরে, প্রশান্ত স্তব্ধতা। ট্রাভার্স আর তার সাকরেদ লেসপারেন্স নির্গতধূম রেগান হাতে। ধাতব রাস্তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। বিলিং আর ক্র্যামার হাঁটু গেড়ে, রে-গান হাতে, ধাতব রাস্তা থেকে সামনের জংগলের দিকে নিবিড় আগ্রহে তাকিয়ে আচ্ছা, ছায়ার মত ও কে আসে? ক্রমে মূর্তি স্বচ্ছ হয়। ধীরে মূর্তি এসে দাঁড়ায় ধাতব-রাস্তার ধারে। তারপর উঠে পড়ে ধাতব রাস্তায়। শেষে কম্পিত পায়ে টাইম মেসিনের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।
—ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ। আমাদের নিয়ম ভঙ্গ করলেও শেষকালে অন্তত ফিরে এসেছেন এ্যাসকেলস।—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লিডার ট্রাভার্স। ট্রাভার্স এসে দাঁড়ায় এ্যাসকেলাসর কাছে। ভাল করে এ্যাসকেলসকে লক্ষ্য করে। তারপর কটন-গজ ওষুধের বাক্স থেকে বার করে, আর তার সাকরেদ লেসপারেন্স, বিলিং, ক্র্যামারের হাতে দেয়। বলে—পরিষ্কার কর।
তারা তাদের নিজ নিজ হেলমেটের উপর থেকে ডাইনোসেরসের ছিটকে আসা রক্ত মুছে ফেলে। পর্বতের সমান উঁচু হয়ে একটু দূরেই রক্তপাত অবস্থায় পড়ে আছে ডাইনোসেরস। বিরাট রেলইঞ্জিন অকেজো হয়ে পড়লে, যেমন সমস্ত ভালবস্ খুলে দেওয়া হয়। সমস্ত লিভারকে শক্ত করে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়, এও তেমনি যেন ডাইনোসেরসের সমস্ত মুখটা হাঁ করে খোলা। চারবাহু দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে ছড়িয়ে, নিঃশ্বাসের ধ্বনি নেই। রক্ত চারদিকে জমাট বেঁধে আছে।
—কড়—কড়—কড়াৎ বিরাট শব্দ চকিতে ভেসে আসে। আকাশচুম্বী গাছের বিরাট ডাল ভেঙ্গে নেমে আসে মৃত ডাইনোসরসের মাথায়। মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়।
—এটাই সঠিক সময়।—বলে উঠে লেসপারেন্স।—এই সময়েই গাছের ডাল

ভেঙ্গে মারা পড়ার কথা ছিল এই ডাইনোসেরসের। তাই এই ডাইনোসরসকে রেড স্পটেড করে মারতে পারা যায় বলেছিলাম আমরা যাতে প্রকৃতির নির্দিষ্ট ভারসাম্যে কোন উলোট-পালট না হয়।—অন্য দুই শিকারী ক্র্যামার আর বিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলে লেসপারেন্স। তা এখন আপনারা 'পুরস্কার-ছবি' নিতে চান ?

—পুরস্কার ছবি ? সেটা আবার কি?—চমকে উঠে বলে ক্র্যামার আর বিলিং শিকারী দুজনে।

—আমরা এই মৃত ডাইনোসেরসের দেহটা বা তার কোন অংশকে এই ছ'কোটি বছরের পুরানো অতীত থেকে বর্তমানে ২০৫৫ সালে নিয়ে যেতে পারি না। কারণ, মৃতজন্তুর এই দেহ এখানেই পড়ে থাকার কথা। কারণ প্রকৃতির নিয়মে, ডাল ভেঙ্গে, ঠিক ওখানেই ওর মরার কথা ছিল। মরেছেও তাই, ঠিক সময়ে। শুধু রে-গানের গুলিতে ডাল ভেঙ্গে নয়। মরার পরপরই ডালটা ভেঙ্গেছে। তফাৎটা শুধু ওখানেই এই মৃত জন্তুর দেহ এখন পাখী ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ঐসব প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। প্রকৃতির ভারসাম্যে এই কাজ কারবারে ব্যাঘাত ঘটাব না। তাই, এই ছকোটি বছরের অতীত জন্তু ডাইনোসেরসকে যে আপনারা দেখলেন, শিকার করলেন, তার নিদর্শণ বর্তমানে ফিরে কি থাকবে ? তাই, যদি চান মৃত ডাইনোসেরস সহ আপনাদের একটা ছবি নিতে পারি। সেটাই থাকবে আমাদের সঙ্গে বর্তমানে ফিরেও। সেটাই হবে আপনাদের পুরস্কার ছবি, ট্রফি পিকচার।

ক্র্যামার আর বিলিং মুখ চাওয়া চাওই করে। তারপর মাথা নাড়ে। বিভৎস ডাইনোসেরসের ক্রুদ্ধ দাপানির ছবি ভেসে উঠে চোখের সামনে। তারা মাথা নাড়ে ভয়ে। বলে,—না, আর ছবি নয়। যা দেখেছি সেটাই পুরস্কার।—ধীর পায়ে টাইম—মেশিনের দিকে ফিরে চলে তারা ধাতব রাস্তা ধরে।

টাইম—মেশিনের সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। টাইম মেশিনের মেঝে থেকে এক অদ্ভুত শব্দ ফুটে উঠছে।—ঝ্যার-ঝ্যার-ঝ্যার।—লক্ষ্য করতেই ট্রাভার্স'রা দেখতে পায় মেঝেতে বসে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে এ্যাসকেলস।

—যাও উঠ। নেমে যাও টাইম মেশিন থেকে। যাও নামো ধাতব—রাস্তায়।—রে-গানটা এ্যাসকেলসের বুকের দিকে উঁচিয়ে ধরে ট্রাভার্স।—নামো। তোমাকে এখানে রেখে ফিরে যাব আমরা।

—আমি দুঃখিত। আমায় ক্ষমা কর।—দুহাত জোড় করে বলে এ্যাসকেলস।

—যাও নামো। বেরোও টাইম মেশিন থেকে।—ধমকে উঠে ট্রাভার্স।

লেসপারেন্স ট্রাভার্সে'র হাতটা চেপে ধরে। বলে,—এ কি করছেন লিডার ? ওকে ক্ষমা করে দিন।

ট্রাভার্স হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে,—ওর মূর্খামির জন্য আর একটু হলেই

আমরা সব্বাই মারা পড়তাম। কেমন পাগলের মত ধাতব রাস্তা থেকে অতীত জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আমাদের কানুনের খেলাপ হয় নি তাতে ?

—তা হয়েছে। তবে, তাবলে ওঁকে এই নির্জন অতীতে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে ?—লিডারকে বোঝায় লেমপারেন্স।

—বুঝছ না কেন লেসপারেন্স, ওই আহাম্মকটা কি করেছে ? ধাতব রাস্তা থেকে অতীতের মাটিতে নেমেছে। সেটা অপরাধ। তার জন্য কত ডলার ফাইন হবে গভর্মেণ্ট কি শাস্তি দেবেন, সে সব ঠিক হবে বর্তমানে ফিরে যাবার পর। সেটা ঠিক করবেন আমাদের কম্পানীর মালিকরা আর সরকার। কিন্তু তাকাও এ্যাসকেলসের জুতোর দিকে। এর জন্য আমাদের কম্পানীর লাইসেন্স বাতিল না হয়ে যায়।—ট্রাভার্স শিহরিত হোতে থাকে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

—আজ, শান্ত হোন ক্যাপ্টেন। ওর জুতোয় ধুলো মাটির দাগ ছাড়া আর কিচ্ছুই তো দেখছি না। তারজন্য চিন্তা করছেন কেন ?—লেসপারেন্স ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে লিডারকে।

—কিচ্ছু হয় নি ? বুঝলে কি করে ? সব কিছু পরে বুঝতে পারবে। অতীত জগতের মাটিতে যে নেমেছে তাকে ঐ ছ কোটি বছরের অতীতেই থেকে যেতে হবে। ওকে ছেড়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কম্পানীকে বাঁচাবার একমাত্র রাস্তা।

—নাঃ নাঃ। যত ফাইন লাগে তাইই দেব। ১ লক্ষ ডলারও ফাইন দেব। তোমরা ফেলে যেও না আমায়।—আর্তনাদ করে উঠে ভয়ে এ্যাসকেলস্।—চেক বুকটা বের করে এ্যাসকেলস্।

চেক বুকের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে ট্রাভার্স বলে, নিতে পারি আমাদের সঙ্গে, শুধু একটা কাজ করতে হবে। ফিরে যাও মৃত ডাইনোসেরসের কাছে। তোমার রিভলবার থেকে যেগুলিটা ছুঁড়েছ সেটা ডাইনোসেরসের গায়ে ঢুকে আছে, সেটাকে তুলে নিয়ে এস।

—সে কি। এ অসম্ভব উদ্ভট পাগলামী।—এ্যাসকেলস্ বলে উঠে।

—উদ্ভট হলেও এ কাজ করতেই হবে। ডাইনোসেরস মৃত। তাই ওর কাছে যেতে ভয় কিসের ? মনে রেখ, ছ কোটি বছরের অতীত যেমনটি ছিল, তেমনিই রেখে যেতে হবে আমাদের। ডাইনোসেরসের মরার কথা মরেছে, ব্যাস। কিন্তু ঐ যুগে বুলেট আসবে কোথা থেকে। বুলেট রেখে যাওয়া মানেই পরিবেশ ভারসাম্যের কোথাও বেখাপ্পা কাজ করে যাওয়া। আমরা তা হোতে দিতে পারিনা।—ট্রাভার্স পরিষ্কার জানিয়ে দেয়।

নেশাগ্রস্থের মত ফিরে যায় এ্যাসকেলস। ধাতব রাস্তা ছেড়ে অতীত জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। কাঁপা-কাঁপা হাতে মৃত ডাইনোসেরসের শরীর খুঁজতে থাকে। শেষে দুটো বুলেট বের করে আনে। তারপর মাতালের মত টলতে টলতে ফিরে আসে টাইম মেশিনের সামনে। এসেই মুর্চ্ছিত হয়ে ঢলে পড়ে

ধাতব রাস্তার উপর।
—নাঃ, এ জুলুম না করলেই পারতেন। বেচারা—চুকচুক করে উঠে লেসপারেন্স।
—জুলুম। তুমি কি ভাবছ, আমি এসব খেয়াল-খুশীতে করেছি বোকা কোথাকার। বুঝবে, কি ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। যাক্ চিন্তা করে আর লাভ নেই। এবার ফেরা যাক। চালু কর টাইম মেশিন।
—ঝন্ ঝন্ ঝন্—চালু হোল টাইম মেশিন। শুরু হোল ফেরার পালা। ছ কোটি বছরের পুরোনো অতীত থেকে ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের বর্তমানে ফেরার পালা আরম্ভ হোল।

…ছকোটি বছর।…পাঁচকোটি।…দুকোটি।…একশ খ্রীষ্টপূর্ব।…যিশুখ্রীষ্ট জন্মালেন।…একশ খ্রীষ্টাব্দ।…পাঁচশ খ্রীষ্টাব্দ।…হাজার খ্রীষ্টাব্দ।…১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ।…১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।…১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।…
সবাই হাত মুখ পা ধুয়ে, ধাতব জামা কাপড় বদলাতে শুরু করল। এ্যাসকেলস্ জামাকাপড় বদলে, চুপচাপ বসে থাকল একধারে। ট্রাভার্স বেশ বদল করে নেবার পর, মিনিট দশেক স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল এ্যাসকেলসের দিকে।
—ও কি? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? আমি কি খুনে? আমি কি এমন অপরাধ করেছি?
—কতটা অপরাধ করেছ, কে বলতে পারে?
—ট্রাভার্স, তোমাদের ধাতব রাস্তা থেকে নামলে ফাইন হবে। সেটা দিয়ে দেব, তাহলেইতো হোল। জুতোয় ধুলো-বালি-কাদা লেগেছে বলে কি হেনস্তাই না করছ।—উষ্মা ঝরে পড়ে এ্যাসকেলসের গলায়।
—চুপ, আর একটা কথা বলেছ কি তোমায় খুন করে ফেলব। দেখছ, হাতের রাইফেলটার দিকে।—রাইফেল তাগ করে বলে ট্রাভার্স।
টাইম মেশিন চলছেই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। এ্যা—অ্যা—ক্।—থেমে গেল টাইম মেশিন। ছকোটি বছরের পুরোনো অতীত থেকে তারা ফিরে এল বর্তমানে, ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। ফিরে এল সেই ঘরে। যেখান থেকে শুরু করেছিল তাদের যাত্রা।
যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেখানে ফিরে এলেও, সব যেন কেমন নূতন নূতন মনে হোতে লাগল এ্যাসকেলসের। সামনের ডেস্কে সেই লোকটাই বসে আছে, কিন্তু ডেস্ক-টেস্ক সব যেন অন্য ধরনের।
—এখানে সব ঠিক আছে তো?—দ্রুত প্রশ্ন করে চিন্তিত স্বরে ট্রাভার্স।
—সব ঠিক আছে ট্রাভার্স। শুভ প্রত্যাবর্তন।—ডেস্কে বসা লোকটা বলে উঠে।

ট্রাভার্স কিন্তু বিস্ফারিত চোখে ঘরের চারদিক দেখতে থাকে। সব যেন কেমন কেমন, কি যেন রূপবদল হয়ে গেছে চারদিকের। কিন্তু কি, ঠিক ধরতে পারে না ট্রাভার্স।

—এ্যাসকেলস, আসুন, আসুন। যাক্, অক্ষতদেহে ফিরে এসেছেন, খুশী তো?—ডেস্কে বসা কর্মচারীটি বলে উঠে।—এ্যাসকেলস্ কিন্তু স্থানুর মতই বসে থাকে। নড়াচড়ার অবস্থা থাকে না তার।

এ্যাসকেলস্ বাতাসের আঘ্রাণ নেয়। বারবার ঘরের চারদিকে তাকায়। ঘরের মধ্যে নেই বাহারী আলোর ছটা, সব যেন ভীষণ নীভু-নীভু-ম্লান। বাতাসের গন্ধ কেমন অন্যরকম, ভারী ভারী। সামনের সেই লোকটাও যেন কেমন কেমন, অন্যরকম। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে, কোথায় যেন কিছু অদল বদল হয়ে গেছে। অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছে এ্যাসকেলস। কিন্তু, সঠিক সব বুঝে উঠতে পারছে না।

মুহূর্তে ফিকে আলোয় সামনের দেওয়ালের সাইনবোর্ডটাকে দেখতে পেল।

শময় ষফর কোঃ

পিরুন অতীতের জে কোন বশরে। ষিকার করুন।

ষুদু অতীতের প্রাণিটীর নাম বলুন।

আপনাকে আমরাই শেই অতিত প্রাণিটীর কাশে নিএে যাব।

আপনি প্রাণিটীকে গুলিভিত্ত করে উত্তেযণার আনন্দ লাভ করুন।

এ্যা! একি! লেখাগুলেরে অক্ষরে এমন উলোট-পালট হোল কি করে? তবে কি, তবে কি—উত্তেজনায় মুখ ঝুলে পড়ে এ্যাসকেলসের। দেওয়ালে রঙিন সবুজ প্রজাপতি আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাবার সময়ে। সেই প্রজাপতি ধাতব হয়ে গেল কি করে?

—নাঃ, নাঃ, তা কি করে হবে। সামান্য ঘাস মাড়িয়ে অতীতের জংগলে গেছি, তার জন্য বর্তমান যুগের এই প্রজাপতি শেষ হয়ে গেল? এই ঘরের বাতাস, মানুষ সব্বার অদলবদল হয়ে গেল? তা কি হয়?

—এ্যাসকেলস তাইই হয়। সেটাই তো ছিল ভয় আমার। অতীতের পরিবেশের মধ্যে সামান্যতম আঘাত কি বিপর্যয় এনেছে লক্ষ্য করুন। ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের যে পৃথিবী থেকে আমরা রওনা হয়েছি আমরা ঠিক সেই পৃথিবীতে সেই পরিবেশে ফিরি নি। আপনার জুতোয় যে ঘাস, লতা-পাতাকে নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট করেছিলেন ছকোটি বছরের অতীতের জংগলে, তারই ফলে, পরিবেশের ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটেছে। নূতন ২০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত হয়েছে।

—সামান্য ঘাস-পাতাও পরিবেশকে এমন বিপর্যস্ত করতে পারে? হা-ভগবান! —মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এ্যাসকেলস্।

অনুবাদঃ **সলিল লাহিড়ী**